সমুদ্র বিশ্বাস

দুর্গাপুজোর অন্তরালে



দুর্গা আদিতে কী ছিলেন? নারী ছিলেন? নাকি পুরুষ ছিলেন? কেনই বা তিনি মদ ও মাংস প্রিয়া ছিলেন? তিনি কি সতী (যে নারী স্বামী-সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের মঙ্গল কামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন) নারী? নাকি নৃত্য পটিয়সী ছলনাময়ী নারী? দুর্গা কি সত্যি সম্মুখে সমরে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন? নাকি তথাকথিত স্বর্গের উর্বসীদের মত শারীরিক ছলা-কলার মোহজালে বেঁধে অসহায় অবস্থায় মহিষাসুরকে খুন করেছিলেন? দুর্গা ও সরস্বতীর মধ্যে বয়সে দুর্গা বড় না সরস্বতী বড়? গণেশ কার্তিক দুর্গার সন্তান? নাকি স্বামী? দুর্গাপুজোয় বেশ্যা বাড়ির মাটি লাগে কেন? কার্তিক-গণেশ কি চোর ডাকাতদের দেবতা ছিলেন? রামচন্দ্র কি লঙ্কার রাজা রাবণকে হত্যা করার জন্য সত্যি সত্যি দুর্গাপুজো করেছিলেন? নাকি মধ্যযুগের কল্পনাবিলাসী কবি কৃত্তিবাসের নব সংযোজন, মন গড়া কাহিনি?

DURGAPUJAR ANTARALA

written by : Samudra Biswas
Six Edition : Kolkata Pustak Mela 2019
Mobile : 9051918701 / 8582833621

প্রকাশক ঃ জনমন, বিকাশ চৌধুরী
গৌরাঙ্গ ভবন, মধ্য দুর্গানগর, কোলকাতা - ৬৫
মোবাইল ঃ ৯০৫১৯১৮৭০১ / ৮৫৮২৮৩৩৬২১

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৮৮৯
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্কত মেলা—১৯৯৯
তৃতীয় প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা—২০০৩
চতুর্থ প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা—২০০৯
পঞ্চম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা—২০১৪
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা—২০১৯

প্রচ্ছদ ঃ তাপস ঘোষ

ISBN : 0-70-26818-39-879

দাম ঃ ₹ 125.00

মুদ্রক ঃ বিকাশ চৌধুরী,
উত্তর বাদড়া (নেতাজী লেন)
পো ঃ ইটালগাছা, কোলকাতা - ৭৯

সমুদ্র বিশ্বাসের অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ ঃ

মতুয়া আন্দোলনের গোড়ার কথা ১১ মার্চ ১৯৮৭	125.00
ইতিহাসের আলোয় মতুয়া আন্দোলন ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮	125.00
গণজাগরণে গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯	125.00
শ্রীচৈতন্য কেন খুন হলেন জানুয়ারি ১৯৯০	125.00
গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন ১৫ এপ্রিল ১৯৯০	125.00
রামচরিত্র কেন গ্রহণযোগ্য নয় ১৫ এপ্রিল ১৯৯১	125.00
মহিষাসুর মহান অসুর ১০ জানুয়ারি ১৯৯১	125.00
প্রবাহমান নম সমাজ ৮ মে ১৯৯২	125.00
মরিচঝাঁপির না বলা কথা ৫ জুন ১৯৯২	125.00
শ্রীকৃষ্ণ এক ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	125.00
বাঙালি জীবনে নৌকাবাইচ্ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২	125.00
লোক কবি ও লোক সমাজ ১০ মার্চ ১৯৯৩	125.00
অর্থ ধর্ম কথা ১৩ জুলাই ১৯৯৩	125.00
বাবাসাহেব আম্বেদকর ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪	125.00
মান্যবর কাঁশিরাম ১৫ মার্চ ১৯৯৪	125.00
মনীষী ক্যুইজ ২৩ আগস্ট ১৯৯৭	125.00
অথ আদিবাস-মূলনিবাসী কথা ১০ অক্টোবর ১৯৯৭	125.00
আন্দামান : একটি প্রামাণ্য নথি ৬ জানুয়ারি ২০০১	125.00
দলিত মুক্তি আন্দোলন (১৯৮৭-২০০২) ৩১ জানুয়ারি ২০০৩	125.00
দলিত সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি (১৯৮৭ - ২০০২) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	125.00
বাংলা ভাগের বলি ১৫ এপ্রিল ২০০৩	125.00
জাত বর্ণের অন্তরালে ১৪ এপ্রিল ২০০৪	125.00
বেদ-পুরাণে লক্ষ্মী-সরস্বতী ৫ মে ২০০৪	125.00
বাংলার বাবু সংস্কৃতি ৫ জুন ২০০৪	125.00
ঘুমন্ত সমাজের জাগ্রত বিবেক ২৭ এপ্রিল ২০১৮	125.00
দলিত মুক্তি আন্দোলন (২০০৩-২০১৮) ১৪ এপ্রিল ২০১৮	125.00
দলিত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি (২০০৩-২০১৮) ১৪ এপ্রিল ২০১৮	125.00

একথা আমাদের বলতেই হবে যে, মোহ সর্বদা মানুষের খোলা দরজা বন্ধ করে দেয়। জ্ঞান অন্ধ মানুষ কুসংস্কার আকড়ে ধরে। আর কুসংস্কারে লিপ্ত মানুষ নিজে তিলে তিলে মরে। আর সমাজকে ঘুনে ধরা পোঁকার মত কুরে কুরে মারে। আর মোহ ছেড়ে মানুষ যদি ভালবাসাকে সঙ্গী করে, তবে মানুষ সর্বদা জয়-বিজয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন কাঁটায়। মোহমুক্ত মানুষ নিজে জ্ঞান আলোয় আলোকিত হয়। অন্যর জীবনেও আলো পৌঁছানোর সঙ্গী হয়। জীবনচর্চা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রচেষ্টাই জ্ঞানের সন্ধান দেয়। 'দুর্গা পুজো বন্ধ হওয়া উচিত' এই শিরোনামে এই লেখাটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই এক শ্রেণির মানুষ রে রে করে ওঠে। এই মারে কি সেই মারে। আমিও ভাবলাম, সত্যি তো আমি বন্ধ করতে বলার কে? বেশির ভাগ মানুষ প্রথমত এবং প্রধানত নিজেকে বোদ্ধা ভাবে। সে অন্যের কথা শুনবে কেন? তাহলে বিষিয় যাওয়া সমাজ বদলের কষ্টগুলোর শেষ পরিণতি এত ভয়াবহ হবে কেন? খুব ছোট বয়সেও দেখেছি—পুজোর চাঁদা সংগ্রহ করাকে কেন্দ্র করে মারামারি করতে। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে নামিয়ে চড়-থাপ্পড় মেরে পকেট থেকে টাকা কেড়ে নিতে। ভিনরাজ্যের গাড়ির চালক হলে তো কথাই নেই। ভিন্ন ভাষার ড্রাইভার হলে গালি অবধারিত। পুজোর চাঁদা আদায়কারীর দল, এক ধরনের বাঙালি যুব সমাজের লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম অমানবিক মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের, পথ চলতি কেউ প্রতিবাদও করে না। পাড়ার লোকের যেমন আনন্দ, তেমনি আতঙ্কও বটে। **চাঁদা দিতে না পারলে নানান অছিলায় বাড়ির টালি ভেঙে দেওয়া বা রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা সাধারণ ব্যাপার ছিল। পাড়ার পুজোর চাঁদা আদায়ের টাকা দেওয়ার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে ধানের জমিও বিক্রি করতে দেখেছি। পাড়া ছেড়ে চলে যেতে দেখেছি।** পুজো, পুজোর চাঁদা ও পুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে এরকম অনেক না জানা কথা চাপা

পড়ে আছে, মানুষের মনে। সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবার মাত্রই আতঙ্কে দিন কাটাতো। পুজো মণ্ডপে গরীব মানুষদের অলিখিত প্রবেশের অধিকার ছিল না।

বুঝতে পারতাম না—খড়-কুটো আর বাঁশ দিয়ে, বানানো এই প্রতিমার মধ্যে এমনকি আছে যে, শিক্ষিত মানুষেরা তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে 'রূপ দাও, অর্থ দাও, বিদ্যা দাও, যশ দাও' বলে প্রার্থনা করে। কোনদিন কোন দেব দেবী কোন গরিব দুখিকে কিছু চাল-ডাল বা টাকা-পয়সা দিয়েছে, এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। যুক্তি ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কোন মানুষ এমন কথা বলেছেন, তার কথাও শুনিনি। পিতা-মাতা সন্তানদের স্কুলে পাঠান-সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা অর্জনের জন্য। কিন্তু আমরা কি শিখি? যেখানে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ মানুষ দু-বেলা পেটপুরে খেতে পায় না, ৮০-৯০ ভাগ মানুষ চিকিৎসার পয়সা জোগাড় করতে না পেরে অকালে মারা যায়। সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে। ভবিষ্যৎ সমাজের ঘরে ঘরে এমন সন্তান জন্মাবে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সমাজ ও সভ্যতার ধারক বাহক হবে, এই আশা নিয়ে এই আলোকপাত। বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় আলোচনা আর আমার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে মূলত এই লেখা। দেবী দুর্গা নামে পুজো করা হয়, তার প্রতি আমার অন্ধ ভালবাসা নেই। আবার তাঁর প্রতি আমার অযথা রাগ বা ঘৃণাও নেই। এরকম একটি খুনের দৃশ্যকে পুজো করা থেকে আমার মধ্যে সত্য জানার চেষ্টা জাগে। খুঁজতে গিয়ে পুরাণ, আদিবাসী সমাজের ধর্ম কথা ও উপকথায় ইতিহসের অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্ম নৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির খণ্ড খণ্ড চিত্র আসনে আসে। যা আমি পাঠকদের সুবিধার জন্য জুড়ে দিলাম।

বর্তমানে বৃহৎ বাংলা এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান। পুজো-পার্বণ প্রিয় কৃষিজীবী তথাকথিত হিন্দু বাঙালীর অতি জনপ্রিয়

উৎসবের নাম দুর্গাপুজো। বিশেষ করে শরৎকালীন বা শারদীয় দুর্গাপুজো। দুর্গা কর্তৃক সুরা-নারী এবং সিংহাসনে আসক্ত নয়, অ্যাসিরিও সভ্যতার উত্তরসুরী মহান অসুর সম্রাট মহিষাসুরকে হত্যা করার দৃশ্য পুজো করার নামই দুর্গাপুজো। বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য ও নানারকম ধর্মীয় আঞ্চলিক কাব্য-কাহিনি পড়লে, অনুসন্ধিৎসু মনে দুর্গা সম্পর্কে এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে। **যেমন দুর্গা আদিতে কী ছিলেন? নারী ছিলেন? নাকি পুরুষ ছিলেন? কেনই বা তিনি মদ ও মাংস প্রিয়া ছিলেন? তিনি কি সতী (যে নারী স্বামী-সন্তান নিকট আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মঙ্গল কামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন) নারী? নাকি নৃত্য পটিয়সী ছলনাময়ী নারী? দুর্গা কি সত্যি সম্মুখ সময়ে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন? নাকি তথাকথিত স্বর্গের উর্বসীদের মত শারীরিক ছলা-কলার মোহজালে বেঁধে অসহায় অবস্থায় মহিষাসুরকে খুন করেছিলেন? দুর্গা ও সরস্বতীর মধ্যে বয়সে দুর্গা বড়? নাকি সরস্বতী বড়? গণেশ কার্তিক দুর্গার সন্তান? নাকি স্বামী? দুর্গাপুজোয় বেশ্যা বাড়ির মাটি লাগে কেন? কার্তিক-গণেশ কি চোর ডাকাতদের দেবতা ছিলেন?** রামচন্দ্র কি লঙ্কার রাজা রাবণকে হত্যা করার জন্য সত্যি সত্যি দুর্গাপুজো করেছিলেন? নাকি মধ্যযুগের কল্পনাবিলাসী কবি কৃত্তিবাসের নব সংযোজন, মন গড়া কাহিনি? দুর্গা সম্পর্কে এরকম বহু প্রশ্ন সু-শিক্ষায় শিক্ষিত জনমানসের মনে জেগে ওঠে। আর এ কারণে এই পুজো উপলক্ষে তিন-চার ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। (এক) আবেগে ভরপুর। কুসংস্কারের ভয়ংকর জালে জড়িয়ে রয়েছে। (দুই) সবাই পুজোয় অংশ করে তাই আমিও অংশগ্রহণ করি। (তিন) এই পুজো করার অজুহাতে নিজস্ব প্রচার ও প্রসার। লজ্জাজনক ক্ষমতার অলিন্দে পৌছানোর প্রচেষ্টা। (চার) পুজোকে উৎসবে রূপ দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ও মোল্লাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা।

হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণগুলিকে ভিত্তি করে মূলনিবাসী হিন্দুরা (সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে বসবাসকারি মানুষজন, যারা বর্তমানে বৃহৎ ভারতে বসবাস করেন) বহিরাগত ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তাই যুক্তি বিজ্ঞান ও কাহিনির পরম্পরা অনুসারে বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বা এক কথায় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র এ ব্যাপারে কী বলে, স্বল্প পরিসরে একটু দেখে নেওয়া যাক। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ধর্মী ধর্মের গঠনগত ও দর্শনগত অনেক ফারাক রয়েছে। মূলত প্রতিটি ধর্মই আলাদা মত ও পথের কথা বলে। যদিও ধর্মধারীরা বলেন, 'সব ধর্ম এক। সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এক।'

মানুষ যদি তার মনা-চোখকে কাজে লাগায়, তবে দেখবে—আচারে বিচারে আলাদা হলেও অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনে সব ধর্ম এক। কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডিত্য ফলিয়ে সহজ সরল জীবনযাপন করার অজুহাতে নীতিগত কর্তব্যগুলোকে এমন জটিল রূপ দিয়েছেন যে, মানুষের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। সাম্যবাদী কিছু মানুষের সহজাত সরল মতাদর্শ কর্মবিমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দিয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানিক ধর্মই শেষ পর্যন্ত কর্মবিমুখ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। তবু বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের মত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত হিন্দুধর্মে বা ব্রাহ্মণ্যধর্মে নেই। একটু খুলে বললে এরকম দাঁড়ায়—**সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে একটি ধর্মগ্রন্থ থাকে। ধর্মগ্রন্থের একজন লেখক থাকেন। একজন আরাধ্য দেবতা বা ঈশ্বর বা অবতার থাকেন। সেই ঈশ্বরের কিছু অন্ধ ভক্ত থাকেন। হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্মে একক কোনও ঈশ্বর নেই। নেই কোনও নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। ধর্মীয় অন্ধভক্তরা নানান কুসংস্কারে বন্দি। জাত-বর্ণের কবলে প্রচলিত হিন্দু জনজীবনের মনে হৃদয়ে নিয়ত রক্তক্ষরণ ঘটে।**

প্রতিটি মতাদর্শে একটি সার্বজনীন বার্তা থাকে। গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শ মূলত

যুক্তি ও প্রচলিত তৎকালীন সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্মকে হীনযান-মহাযান-বজ্রযান' এরকম অনেক যানে ভাগ করলেন শুধু নয়, পাপ-পুণ্য-জন্মান্তর ঢুকিয়ে দিলেন। যা গৌতম বুদ্ধ চান নি। অহিংসা প্রাধান্য বৌদ্ধ ধর্মের শাসক ও ধারক-বাহকেরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন না। যিশু তাঁর অনুগামীদের ক্ষমা ও ভালবাসার কথা বললেন। লোভী রাষ্ট্রনেতা ও নিষ্ঠুর ধর্মবাহকেরা যিশুর জীবন ভয়াবহ করে দিল। পরবর্তীকালে আবার যিশুর মতাদর্শকে সামনে রেখে শুরু হল কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মযুদ্ধ। নিহত হল কয়েক লক্ষ মানুষ। খ্রিষ্টানধর্ম ন্যায়-অন্যায়, পারিবারিক ও বংশমর্যাদায় বিভক্ত হয়ে পড়ল। যিশুর মতাদর্শেরই সঙ্গে জুড়ে গেল কয়েকশত বাস্তব ভিত্তিহীন কুসংস্কার ও অলীক উপকাহিনি। এ নিয়ে নিজ ধর্ম লোকেদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি লেগে আছে। হজরত মহম্মদ শান্তি ও সম্মানের বার্তাবাহক। অন্তত প্রচার তাই আছে। তাঁর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একাধিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও করলেন। তার অনুগামীদের ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর লড়াই-এর বার্তা দিলেন। রক্তের বন্যা আর মানুষের কান্না আজও বহমান। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অদ্যাবধি ইসলামের তথা কোরান, হাদিসের দোহাই দিয়ে অগণিত গরিব মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে, মুসলমানে মুসলমানে বিভৎস গণহত্যা সভ্যতার লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সত্য কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। আর উগ্র ধর্মবাদীদের দ্বারা নারী নির্যাতন মুখে বলতেও ঘৃণা বোধ জন্মে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা সমষ্টির মদাতর্শ যখন কর্মবিমুখ পণ্ডিত ও শাসকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দেন, তখনই সাধারণ মানুষ অমানবিক অনুশাসনের শিকার হন। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মে নানা তথাকথিত দেবতা থাকার ফলে তাদের রয়েছে নানান মতবাদ। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনওরকম

বনিবনা নেই। কায়েমী স্বার্থবাহী প্রথাই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি। ধর্মীয় সংস্কার হেতু কোটি কোটি মানুষ হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাঁতাকলে ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন বলে পরিচিত। ঋগ্বেদের কোথাও দুর্গা নামটি পাওয়া যায় না। তবে ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৫তম সূক্তকে "দেবী সূক্ত" বলা হয়। কিন্তু এর আটটি মন্ত্রের মধ্যে কোথাও দুর্গার নাম পাওয়া যায় না। ১২৭তম সূক্তটি "রাত্রিসূক্ত" নামে পরিচিত। এখানে রাত্রিদেবীর রূপ বর্ণিত আছে। বৈদিক রাত্রির দেবী কৃষ্ণবর্ণা। যিনি পরবর্তীকালে প্রাচীন দেশজ দেবী কালীর সঙ্গে অভেদ হিসেবে গৃহীত হয়ে "কালী" নামে আজও এক শ্রেণির মানুষের কাছে পূজিত হয়ে থাকেন। দেবী কালীর রূপ ও কাহিনিও অগণিত। ভৌগলিক অবস্থান এবং মানুষজনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেব-দেবী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ভিন্নরূপে গড়ে উঠেছে। কল্পিত কোনও দেব-দেবীর কিছু চিহ্ন বা দেওয়াল চিত্র থাকলেও গোটা বৈদিক যুগে দুর্গার এ ধরনের কোনও চিহ্ন বা চিত্র বা মূর্তি ছিল না। তাই বলা যায়, দুর্গা প্রাচীন দেব-দেবীর মধ্যে পড়েন না।

ঋগ্বেদের অনেক পরের ঘটনা ও লেখা যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ উপনিষদে দেবী দুর্গার নাম প্রথম পাওয়া যায়—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং/ধেরচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্/দুর্গাং দেবীং শরণ মহং প্রপদ্যে/সুতরসি ততরসে নমঃ"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত **যাজ্ঞিকা উপনিষদের 'দুর্গা গায়ত্রী'-তে বলা হয়েছে, "কাত্যায়নায় বিমহে, কন্যকুমারী ধীমহে, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়েৎ"। অর্থাৎ আমরা কাত্যায়নীকে স্মরণ করি, কন্যাকুমারীর ধ্যান করি, দুর্গি আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন। এখানে দুর্গি শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গাত্মক নয়, পুরুষ লিঙ্গাত্মক। এক্ষেত্রে দুর্গা নারী নয়, পুরুষ। যদিও**

সায়ানাচার্যের মতে, 'দুর্গা গায়ত্রী'-তে উল্লিখিত দুর্গি শব্দটি দুর্গা শব্দের সমার্থক। তথাপি, 'দুর্গা গায়ত্রী'র দুর্গি বা দুর্গা পুরুষ ছিলেন? নাকি নারী ছিলেন? এ নিয়ে মতবিরোধ রয়ে গেল। ঋগ্বেদে দুর্গার নাম নেই, কিন্তু সরস্বতীর নাম আছে। যেহেতু তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মতে, ঋগ্বেদকে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ধরা হয়, সেহেতু ঋগ্বেদ অনুযায়ী দুর্গা, সরস্বতীর চেয়ে অনেক ছোট। আবার ঋগ্বেদের অনেক পরে লেখা শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে দুর্গা, অতিদি বাক, সরস্বতী অভিন্ন। অর্থাৎ, যেই দুর্গা সেই সরস্বতী। দুর্গা আর সরস্বতীকে যেমন এক করার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি দুর্গা ও কালীকে এক করার প্রচেষ্টাও চলেছে বহুযুগ ধরে। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তকে রাত্রিদেবী, বৈদিক রাত্রিদেবীকে বৈদিক পূর্ববর্তী দেবী কালীর সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে প্রাচীন সরস্বতী দেবীর সঙ্গে খ্রিষ্ট পরবর্তী দেবী দুর্গাকে অভিন্ন রূপে প্রচার করা হয়েছে। **কর্ম বিমুখ শাস্ত্রকারদের এ সকল লজ্জাজনক প্রচেষ্টা মাত্র। নানা পণ্ডিত নানাভাবে দেবী দুর্গার জীবনকাল খ্রিষ্টপূর্বাব্দ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দুর্গাকে সর্বপ্রাচীন দেবী বা মানবী রূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ প্রাচীন পুঁথিতে দুর্গার নাম পাওয়া যায় না।** বরং দুর্গাকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনি আছে, সেগুলি বিশ্লেষণের পাশাপাশি দুর্গার মূর্তি, পোষাক ও অলংকার দেখলে অতি সহজে দুর্গার জীবনকাল ধরা যায়। ত্রবং অবশ্যই দুর্গা খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নয়, বরং খ্রিষ্ট পরবর্তীকালের। দুর্গা তৎকালীন জম্বুদ্বীপের নয়, বিদেশী ইরান-ইরাকীয় যাযাবর কন্যা।

বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর আর এক নাম অম্বিকা। এই অম্বিকা রুদ্রের সাথে সম্পর্কিতা ছিলেন। কোথাও ভগিনীরূপে, আবার কোথাও স্ত্রী বা পত্নীরূপে।

শুক্ল যজুর্বেদের রাজসনেয়ী সংহিতায় (১/৮, ৬/১১) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অম্বিকা হলেন রুদ্রের ভগিনী। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০/১৮) অম্বিকা হলেন রুদ্রের পত্নী বা স্ত্রী। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বেশিরভাগ শাস্ত্রকারদের অদ্ভুত পাগলামি এমন যে, দুর্গা এক শাস্ত্রে ভগিনী তো আর এক শাস্ত্রে পত্নী। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বোন আর বউয়ের মধ্যে কোনও ফারাক রাখেননি। তবে মাতা-কন্যা, বধূ-ভগিনী বোধ যে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের বেদের যুগে ছিল, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের বর্ণনায় দেখা যায়—ইন্দ্রের প্রেরিত দূত সরমা সুন্দরী পণিগণের অর্থাৎ ভারতীয় বণিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে, গো-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। সরমা সুন্দরী, ইন্দ্র ও অঙ্গীরার পুত্রদের নামে হুমকি দিলেও পণিগণ (সিন্ধুবাসী বা হিন্দুবাসী বণিক বা বর্তমান ভারতীয় মূলনিবাসী।) ভয় না পেয়ে সরমাকে ভগিনী সম্বোধন করেন এবং বলেন, "আমরা তোমাকে গোধন দিচ্ছি। তুমি তাই নিয়ে আমাদের এই দেশে সুখে-শান্তিতে বাস কর"। প্রত্যুত্তরে সরমা সুন্দরী বলেন, "আমি ভ্রাতা-ভগিনী সংক্রান্ত কথা বুঝতে পারি না"। একথার মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাযাবর আর্য দস্যুদের মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনী বা সুস্থ সংস্কৃতি বা সভ্য সভ্যতার লেশমাত্র ঘটেনি। কিন্তু তৎকালীন জম্বুদ্বীপবাসী কিন্তু সুসভ্য ছিলেন। সভ্য ছিলেন বলেই সরমাকে এমন সম্মান সূচক সম্বোধন করেছিলেন। প্রাচীন বা পুরাণকালে দেবতা বা আর্যদস্যুদের প্রেরিত দূত বা গুপ্তচর হলেন সরমা সুন্দরী। প্রাচীন বা পুরাণকালে দেবতা বা আর্যদস্যুরা নারী ও ব্রাহ্মণ্য ঋষিদের গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করতেন। বিশ্বামিত্র ঋষি বাল্যকালে রামচন্দ্রকে দিয়ে তাড়কাসুর হত্যা করিয়েছিলেন। দেশজ মানুষকে দিয়ে অর্থাৎ হনুমানকে দিয়ে রাবণরাজ্য শ্মশানে পরিণত করেছিলেন। হনুমান হলোদেশজ মূলনিবাসী

মানুষ, যাকে রামচন্দ্র গুপ্ত চর হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। মূলনিবাসী মানুষ মাত্রই এ সত্য বিশ্বাস করেন। সেকালে নারীর কোনও মান-মর্যাদা ছিল না। আর্য মহিলাদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিক্রয় করা হত। আর্য বিবাহপ্রথা হল, কন্যা বিক্রয়ের প্রমাণস্বরূপ পরিভাষাগত শব্দ অনুযায়ী পুত্রের পিতা গো-মিথুন দিয়ে কন্যাকে নিয়ে যেতেন! বালিকাটিকে গো-মিথুনের পরিবর্তে বিক্রয় করা হল বলা আর একটি প্রণালী। গো-মিথুন অর্থ একটি গাভী ও একটি বলদ যা একজন বালিকার মূল্যের জন্য যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হত। গো-মিথুন দ্বারা এটা বোঝানো হত যে, সন্তান উৎপাদনই নারীর একমাত্র কাজ। শুধুমাত্র বালিকারাই যে তাদের পিতার দ্বারা বিক্রীত হত তা নয়, স্বামীরাও তাদের স্ত্রীদের বিক্রয় করতেন। হরিবংশের ৭৯তম অধ্যায়ে বলা বিবরণে আছে, কেমন করে যজ্ঞকারী পুরোহিতকে তাঁর দক্ষিণা দেওয়ার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়, যার নাম পুণ্যব্রত। এখানে বলা হয়েছে যে, **ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের তাঁদের স্বামীর কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে এবং সেই স্ত্রীদের যজ্ঞকারী পুরোহিতকে দক্ষিণা হিসাবে দেওয়া হবে। এই বিবৃতি থেকে এটা নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্ত্রীদের কিছুর পরিবর্তে অবাধে বিক্রয় করতেন। আর্যরা তাদের স্ত্রীদের খাজনার পরিবর্তে সহবাসের জন্য অন্যদের দিতেন। মহাভারতের ১০৩ থেকে ১২৩ অধ্যায়ে মাধবীর জীবন কথার বিবরণ আছে।** এই বিবরণ অনুসারে, মাধবী ছিলেন রাজা যযাতির কন্যা। যযাতি গল্বাকে উপহার দেন তাঁর কন্যাকে। গল্বা ছিলেন একজন ঋষি এবং তাঁকে পুরোহিতের দক্ষিণা হিসাবে এই উপহার দেওয়া হয়েছিল। গল্বা তাঁকে খাজনার পরিবর্তে তিনজন রাজাকে পরপর ভোগ করতে দেন। কিন্তু প্রত্যেককে সেই মহিলার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য দিয়েছিলেন। তৃতীয় রাজার স্বত্ব ভোগের কাল সমাপ্ত হবার পর গল্বা মাধবীকে তাঁর গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে সমর্পণ করেন এবং

বিশ্বামিত্র তাঁকে তাঁর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র তাঁর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে তাঁর কাছে রাখলেন এবং তারপর তাঁকে গল্বার কাছে প্রত্যর্পণ করেন। গল্বা তাঁকে তাঁর পিতা যযাতির কাছে প্রত্যর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে যমযমীর কাহিনিও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ঋগ্বেদ অনুযায়ী তাঁরা (যম-যমী) বিবসান ও সুরন্যুর সন্তান। জম্বুদ্বীপ বা ভারতীয় ভাষায় যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যমী তার ভ্রাতা যমের সঙ্গে সঙ্গম আকাঙ্খা করেন। কিন্তু যম তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের দশম সূক্তে যমী তার ভ্রাতা যমকে বলছেন—'বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্তী এ দ্বীপে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী। কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মাবে।' যম তার উত্তরে বলছেন—'তোমার গর্ভ সহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যেহেতু তুমি তার সহোদরা ভগিনী, তুমি অগম্যা।' যমী তার উত্তরে বলছেন—'যদিও কেবল মানুষের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও। এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই'। যম যমীর এরূপ কথার উত্তরে বলছেন—'তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই'। একথার উত্তরে যমী বলছেন—'তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি (ঋগ্বেদ ১০/১০/৭/১৪)'। তাহলে একথা পরিষ্কার যে, সাধারণ মানুষের সমাজে ভাই-বোনের মধ্যে সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বর্গের দেবতাদের (আর্যদস্যু বা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজের) ভাই-বোনের মধ্যে সহবাস প্রচলিত ছিল। পাশাপাশি ভালোর সংস্পর্শে সকলে ভালো গুণের অধিকারী হওয়া যায়।

যেমন—যমের মধ্যে পরিবর্তন আসছে। আর্যদের বিবাহ সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনা এ যুগের দৃষ্টিতে বড্ড লজ্জাকর। ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যা শতরূপাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র মনু ছিলেন পৃথু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই সাম্রাজ্য ছিল ঐশ্বক এবং ঐলাসদের উত্থানের পূর্ববর্তী।

হিরণ্যকশিপু তাঁর কন্যা রোহিণীকে বিবাহ করেন। পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিবাহের অন্যান্য দৃষ্টান্ত হল বশিষ্ঠ ও শতরূপা, জহ্নু ও জাহ্নবী এবং সূর্য ও ঊষা। কানীন পুত্রদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা নির্দেশিত হয় যে, পিতা-পুত্রীর যৌন সম্পর্ক তখন প্রায়ই ঘটত। কানীন পুত্রের অর্থ অবিবাহিত কন্যার সন্তান। যেমন—মহাভারতের কুন্তী পুত্র কর্ণ। আইনত তারা ছিল সেই কন্যার পিতার সন্তান। বহুক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই তারা ছিল, পিতার ঔরসজাত নিজ কন্যার গর্ভের সন্তান। কেননা, দেবতাদের মধ্যে ভাই-বোন, মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে বোধ ছিল না। লজ্জাজনক সম্পর্কে দেবতাদের তুলনা হয় না।

এরকম দৃষ্টান্ত আছে যেখানে পিতা পুত্র একই মহিলার সঙ্গে সহবাস করছেন, ব্রহ্মা মনুর পিতা এবং শতরূপা তার মাতা। এই শতরূপা আবার মনুর স্ত্রী। আর একটি দৃষ্টান্ত হল শ্রদ্ধার। তিনি হলেন বিবস্বতের স্ত্রী। তাদের পুত্র মনু। শ্রদ্ধা আবার মনুর স্ত্রীও। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করার পথও তাঁর উন্মুক্ত ছিল। ধর্ম দক্ষের দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। যদিও দক্ষ ছিলেন ধর্মের ভাই। একজন তাঁর খুড়তুতো বোনকেও বিবাহ করতে পারতেন, যেমন করেছিলেন কশ্যপ। তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন ১৩ জন যাঁর সকলেই ছিলেন দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ ছিলেন কশ্যপের পিতা ও মরীচির ভ্রাতা।

মহাভারতের আদি পর্বের বংশ বৃত্তান্ত অনুসারে ব্রহ্মের ছিল তিন পুত্র—মরীচি, দক্ষ, ধর্ম এবং এক কন্যা, যে কন্যার নাম বংশ বৃত্তান্তটি মহাভারতে নেই। এই বংশ

বৃত্তান্তেই বলা হয়েছে যে, দক্ষ ব্রহ্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। যিনি ছিলেন তাঁর ভগ্নী। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিল, যাঁদের সংখ্যা বিভিন্ন আন্দাজমত ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। ভ্রাতা-ভগ্নির বিবাহের অন্যান্য দৃষ্টান্তও দেখানো যেতে পারে। তাঁরা হলেন পূষণ ও তাঁর ভগ্নি অচ্ছোদা এবং অমাবসু। পুরু কুৎসা ও নর্মদা, বিপ্রচিতি ও সিংহিকা, নহুষ ও বিরজা, শুক্র-উষানস ও গো, অংশুমত ও যশোদা, দশরথ ও কৌশল্যা, রাম ও সীতা, শুক ও পিবরী, দ্রৌপদী ও প্রস্তি—এগুলি সবই ভ্রাতা-ভগ্নি বিবাহের দৃষ্টান্ত।

পুত্রের মাতার সঙ্গে এবং পিতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পুত্রীস্থানীয়দের সহবাসে কোন বিধিনিষেধ ছিল না ব্রাহ্মণ্যসমাজে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পূষণ এবং তাঁর মা, মনু এবং শতরূপা ও মনু এবং শ্রদ্ধা, অর্জুন ও উর্বশী এবং অর্জুন ও উত্তরা। উত্তরার বিবাহ হয়েছিল অভিমন্যুর সঙ্গে যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬। উত্তরা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অর্জুন তাঁকে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। উত্তরা অর্জুনের প্রেমে পড়েছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারত বলে, প্রেম সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তাদের বিবাহের কথা। মহাভারত অবশ্য বলে না যে, বাস্তবে তাদের বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু যদি তাই হত, তাহলে বলা যেত যে, অভিমন্যু তাঁর মাকে বিবাহ করেছেন।

ইন্দ্র ছিলেন অর্জুনের প্রকৃত, পিতা। উর্বশী ছিলেন ইন্দ্রের প্রণয়িনী এবং সেই সূত্রে অর্জুনের মাতৃস্থানীয়া। তিনি ছিলেন অর্জুনের শিক্ষক এবং তিনি অর্জুনকে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। উর্বশী অর্জুনের প্রেমমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর পিতা ইন্দ্রের সম্মতিক্রমে অর্জুনকে যৌন সঙ্গমে আহ্বান করেছিলেন। উর্বশীর এই আচরণ ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি কারণে। উর্বশীর অর্জুনের প্রতি সেই অনুরোধ এবং ইন্দ্রের এক্ষেত্রে সম্মতিদান দেখায় যে, উর্বশী উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি রীতি অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত

উর্বশী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি স্বীকৃত প্রথা। অর্জুনের পিতৃ-পুরুষেরা সকলেই ঐ ধরনের আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন। এবং অবশ্যই কোনওরকম অপরাধবোধ ছাড়াই।

প্রাচীন ভারতে সহবাসের ক্ষেত্রে কীভাবে রক্তের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হত, সে বিষয়ে হরিবংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত এই কাহিনিটির চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য কোনটিই নয়। সেই কাহিনি অনুসারে সোম ছিলেন দশ পিতার সন্তান—যেটি বহুভর্তৃক প্রথার অস্তিত্ব স্মরণ করায়—এই দশজনের প্রত্যেককেই বলা হত প্রলৃহেতো। সোমের একটি কন্যা ছিল, মরিশা—সোমের দশ পিতা এবং সোম নিজে মরিশার সঙ্গে সহবাস করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত যেখানে দশ পিতামহ এবং পিতা একজন মহিলার সঙ্গে বিবাহিত এবং যে মহিলা ছিলেন তাঁর স্বামীদের পৌত্রী এবং কন্যা। ঐ একই অধ্যায়ে দক্ষ প্রজাপতির কাহিনি বলা হয়েছে। কথিত আছে যে, এই দক্ষ প্রজাপতি, যিনি ছিলেন সোমের পুত্র, তাঁর ২৭টি কন্যাকে তিনি তাঁর পিতা সোমকে সন্তান উৎপাদনের জন্য দিয়েছিলেন। হরিবংশের তৃতীয় অধ্যায়ে রচয়িতা বলছেন যে, দক্ষ তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর নিজের পিতা ব্রহ্মার সঙ্গে এবং ব্রহ্মা সেই পত্নীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম দেন, যিনি নারদ নামে বিখ্যাত হন। তাহলে, কি দাঁড়াল? দেবতাদের মধ্যে ধর্মীয় আইনে গণ ধর্ষণ স্বাভাবিক কর্ম বলে পরিগণিত হতো।

শাক্ত উপনিষদে দুর্গাকে মহালক্ষ্মী, সরস্বতী ও বৈষ্ণবীর সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ যেই দুর্গা সেই লক্ষ্মী, যেই লক্ষ্মী সেই সরস্বতী। বেশ কিছু পুরাণে দুর্গাকে অপর্ণা ও পর্ণশবরী বলা হয়েছে। অপর্ণা অর্থে পত্রহীনা অর্থাৎ, পাতার পোষাকও যার নেই, অর্থাৎ নগ্নশবরী। একাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট, দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন ও শূলপানির লেখায় দেখা যায়, তিনি শবলন্দর, মারবার ও

পুলিন্দদের উপাস্য। এরা মধ্যভারতের বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলবাসী। দুর্গাকে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য চক্রান্ত সম্পূর্ণ সার্থক। কেননা, দক্ষিণের শাস্ত্রে দুর্গার সগর্ব উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রাচীন দুর্গার মূর্তি বলে প্রচার করা হয়েছে যাকে, তিনি প্রথম খ্রিষ্টাব্দের দুই হাত বিশিষ্ট এক কৃষ্ণাঙ্গী। সেখানে মহিষাসুর নেই। মূলনিবাসী মহান অসুর মহিশাসুরকে হত্যা করার মত জঘন্য ও অমানবিক এই দৃশ্যর বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষদের বিদ্রোহের ফলে মহিশাসুর মূর্তি সরানো হয়। চতুর্থ শতকে উত্তরপ্রদেশের বিহিটায় পাওয়া যায় দুর্গার মূর্তি যা অতসী বর্ণাও নয় এবং দশ হাতেরও নয়। **বৌদ্ধযুগে কনিষ্ক এবং হরিষ্কর মুদ্রায় পাওয়া সিংহবাহিনী লক্ষ্মীর মূর্তি গুপ্তযুগে এসে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় সিংহহস্তা দেবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ। দুর্গার সর্বভারতীয় প্রচার দেওয়ার জন্য প্রাচীন লক্ষ্মী মূর্তিগুলিকে দুর্গার মূর্তি বলে জনসমাজে প্রচার করেছেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা।** দুর্গার হাতের সংখ্যা ঠিক কত তা বলা মুশকিল। কারণ, কোনও কোনও পুরাণে দুই হাত, চারহাত, আটহাত, দশহাত, আঠার হাত থেকে হাজার হাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মূর্তিগুলি প্রায় সবই লক্ষ্মীর। বিন্ধ্যের প্রাচীন এলাকা দুর্গ-এর মেয়ে দুর্গার সঙ্গে দুর্গাকে মিলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও করা হয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে দুর্গার নাম, স্তব ও স্তোত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ পর্বে অর্জুন কথিত দুর্গার স্তব আছে। ভীষ্মপর্বে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে দুর্গার নিকট জয় প্রার্থনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মহাভারতের দেবী দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা ও চতুরাননা কুমারী। তিনি মদ ও মাংসপ্রিয়া ও অসুরনাশিনী দেবী ছিলেন। মহাভারতের বিরাট পর্বে দুর্গার স্তবে দুর্গাকে 'নন্দ গোপকূলে জাতা' কুমারী বলা হয়েছে। তখনও তিনি শিবের পত্নী হননি। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, মহাভারতের দুর্গা আর বর্তমানের বাঙালির শরৎকালীন দুর্গা এক নয়। তবে

একই কথা-কাহিনির ছায়া অবলম্বনে লিখিত এবং বিচিত্র। মহাভারতের দুর্গার চার হাত, চার মাথা। সধবা নন, কুমারী। এই দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা। আর বাঙালির শারদীয়া দুর্গার এক মাথা, দশ হাত, গৌরবর্ণা যার স্বামী সন্তান আছে। যদিও পুরাণ শাস্ত্র মতে, দুর্গার প্রত্যেকটি সন্তান দুর্গার থেকে বয়সে অনেক বড়। **তবে মহাভারতের দুর্গার সঙ্গে বর্তমানের শারদীয়া দুর্গার কয়েকটি মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। দুই দুর্গাই মদ ও মাংস প্রিয়া। দুই দুর্গাই দেবতাদের অর্থাৎ আর্যদস্যুদের বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বা শ্রমবিমুখ মানুষের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আর্যপূর্ব সুসভ্য অসুর (সুরা নারী সিংহাসনে আসকত নন) বা শ্রমজীবী মানুষ নিধনকারী।**

দেবী দুর্গার আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, যাগযজ্ঞ ও চতুর্বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধ মতবাদী অসুরশক্তির কবল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে উদ্ধারের জন্য দুর্গার উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে। চণ্ডীতে এগারো অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকে দুর্গা তথা মহাদেবীর মুখ থেকে বলানো হয়েছে—

যথা যথা বাধা দান বোথা ভবিষ্যতি।
তদা তদা বর্তীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।

অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবের ফলে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব। অসুর হল এই ভূ-খণ্ডের মূলনিবাসী। মহান অ্যাশিরিয় (এশিয়া) সভ্যতার ধারক-বাহক। আরও পরিষ্কার করে বললে এরকম দাঁড়ায় যে, ভারতীয় মূলনিবাসী মানুষদের যখনই মানবিক ঐক্যর জাগরণ ঘটবে, তখনই আর্য-ব্রাহ্মণরা তাদের সহযোগী সুযোগ-সন্ধানীদের নিয়ে ছলনাময়ী নারীকে কাজে লাগিয়ে; মূলনিবাসী মানুষদের বিনাশ করবে। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমকে ঘৃণা ও শ্রমজীবী মানুষদের ধংসই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মূল ধর্ম। যা নিয়ে

শ্রমজীবী ধর্ম অন্ধ মানুষেরা গর্ববোধ করে। শ্রমজীবী মূলনিবাসী মানুষের কাছে এ বড়ই লজ্জার। মূলনিবাসী মানুষদের পিছিয়ে পড়ে থাকার অন্যতম কারণ।

জাতিবর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত আর্য সমাজের বিপক্ষে শ্রমজীবী মানুষ, চার্বাকবাদীরা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাই ছিল "দেব-শত্রু অসুর"। এদের সকলকে দমন-পীড়ন করে অথবা বিনাশ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণের আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান'ই ছিল দেবী দুর্গা নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

হিংসা দ্বারা কখনই হিংসা প্রশমিত করা যায় না। অহিংসার দ্বারাই হিংসা প্রশমিত করতে হয়। ভালবাসাই হিংসাকে বিনষ্ট করতে পারে। অযথা হিংসা নয়। মুক্ত মনে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে; মানুষের কল্যাণই জম্বুদীপবাসীর ধর্ম। হিংসা নয়, মানবিক অহিংসার পূজারী বৌদ্ধ এবং কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করতেন বলে, ব্রাহ্মণ রচিত বিভিন্ন পুরাণ-এ সম্রাট অশোককে 'বৃষল' অর্থাৎ অধার্মিক,এবং গৌতম বুদ্ধকে 'চোর' বলা হয়েছে। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে (১০৯/৩৪) তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

"যথা হি চৌরঃ
স তথাহি বুদ্ধ"

মেহেরগড় বা সিন্ধু সভ্যতায় সিংহবাহিনী ও অসুর নিধনকারিণী রণদেবী রূপে কোনও দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরির অন্যতম গুহা বরাহ গুহা থেকে প্রাপ্ত মহিষাসুর মর্দিনীর দ্বাদশভূজা মূর্তিটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া দেবীদুর্গার সব মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রথম খ্রিষ্টাব্দ থেকে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিক দেশের সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে মূলতঃ গ্রীস দেশীয় দেব-দেবী ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে এদেশে। বলা যায়, পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিক দেশীয় দেবীদের প্রভাবে চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে দেবী দুর্গার জন্ম হয়।

বঙ্গদেশে দুর্গার প্রচার ও প্রসার ঘটে আরো পরে, পঞ্চ দশ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞান এখনও পূর্বজন্ম-পরজন্ম বলে কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। তবু হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণকারেরা পূর্বজন্ম-পরজন্মের তত্ত্ব মানুষের মনে গ্রথিত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই দুর্গাকে কখনও সতী, কখনও সরস্বতী বা কালী বানিয়েছেন। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই মতবাদ প্রচারও এক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম গ্রন্থ না পড়লে, ধর্ম ভালো। আর পড়লে ধর্ম বিবিষিকাময়। মাথা গোলানোর ধারালো অস্ত্র। তাই ধারালো অস্ত্রের মুখোমুখি মানুষ হতে চায় না। বরং গুলানোর মাথায় পরজীবী ব্রাহ্মণদের ওপর ছেড়ে দিয়ে দাস-দাসানুদাস-ভক্তদাসে পরিণত হয়। কথায় বলে, ধর্মে অন্ধবিশ্বাসীরা গাধা-গরুর মত পরিশ্রম করে মরে। আর ধর্মের মাতব্বররা তাদের কাজে লাগিয়ে পরিশ্রম মানুষের উপার্জিত ফসল ভোগ করে।

যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, এই সকল কাহিনিগুলিকে 'মিথ' (myth) বলেন। মিথ শব্দটির বাংলা করলে দাঁড়ায় পুরাণ বা গূঢ় অর্থপূর্ণ পুরাণকাহিনি। যথার্থ অর্থে মিথ শব্দটির অর্থ fallacious story, বলেছেন মানব বিজ্ঞানী লেভি স্টোস এবং অধ্যাপক শংকর বসুমল্লিক। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'জাতিভেদ' গ্রন্থে বলেছেন—"যুগে যুগে দেখা যায় অনেক পুরাতন জাতি লুপ্ত ও নতুন জাতি উদ্ভূত হয়েছে। তাই বোধহয় বেদে উল্লিখিত বহু জাতি স্মৃতিতে নেই, স্মৃতিতে উল্লেখিত বহু জাতির কোনও সংবাদ বেদে মেলে না। বেদের অনেক জাতি পরে কী হইয়া গেল বলা কঠিন। যুগে যুগে নামেরও পরিবর্তন হইতে পারে। তবে চতুবর্ণের বাঁধা নাম দিয়ে সব যুগের একই জাতিকে সবসময় বোঝানো যায় না। এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদের নাম স্মৃতিতে দেখি। কিন্তু বেদের মধ্যে কোথাও তাহাদের কোনও পরিচয় মেলে না।"

দুর্গাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণগুলিতে বেশ কয়েকশত গল্প বা কাহিনি আছে। সেসব গল্প বা কাহিনিতে দুর্গার জন্মবৃত্তান্ত ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মতভেদ থাকলেও অসুর বা আর্যপূর্ব ভারতীয় নিধন নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। সব গল্পগুলি আলোচনাও উদ্দেশ্য নয়। সবচেয়ে প্রাচীন ও দেবীর অন্ধ ভক্তদের গ্রহণযোগ্য কয়েকটি কাহিনি পুরাণ শাস্ত্র থেকে উল্লেখ করা হল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ চণ্ডীর (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) ভূমিকাতে লেখা আছে যে, রাজা সুরথ ও সমাধি নামে এক বৈশ্য ব্যক্তির কাছে মেধা ঋষি যে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন তা মার্কণ্ডেয় মুনি পরে তাঁর শিষ্য ভাগুরি মুনিকে বলেছিলেন। এরপর ভাগুরি কথিত বিবরণ থেকে জানা যায়, দ্রোণ মুনির চার পুত্র (অভিশাপে পক্ষীযোণি প্রাপ্ত বিঙ্গ খা, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন—

প্রাগার্য ভারতীয়দের অর্থাৎ আজকের ভাষায় দেশজ বা মূলনিবাসীদের আজকের রাজ্য কেড়ে নিয়ে বংশ পরম্পরায় রাজা সুরথ রাজত্ব করতেন। একবার রাজা সুরথ কোল আদিবাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে গড় জঙ্গলে পালিয়ে আসেন। রাজত্ব, রাজ্যপাট হারিয়ে মনের দুঃখে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সঙ্গে সমাধি বৈশ্য নামে এক বণিকের দেখা হয়ে যায়। সমাধি বৈশ্যও নিজ পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য পরস্পরের দেখা হওয়ার পর একে অপরকে নিজেদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা খুলে বলেন। পরস্পর পরস্পরের সহযোগী বন্ধু হয়ে পড়েন। পরস্পর ভাগ্য বিপর্যয় থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে লাগলেন। একদিন জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা মেধস মুনির আশ্রম আবিষ্কার করলেন। কথা প্রসঙ্গে এক সময় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মুনি মেধসের নিকট জানতে চাইলেন, কেন সব হারিয়েও তাদের মন থেকে নিজেদের পরিবার, রাজ্য, রাজত্ব নিয়ে মোহ যাচ্ছে না?

কেনই বা তাঁরা সেই স্মৃতি ভুলতে পারছেন না? মেধস মুনি একথার উত্তরে বলেন, জগতে সমস্ত আসক্তির মূলে কাজ করে মোহশক্তি 'মায়া'। আর এই মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন সর্বশক্তি 'মহামায়া'। কে এই মহামায়া? রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তরে মেধস মুনি তাদের দুর্গার কাহিনি শোনালেন। বললেন, জগতে দেব-শত্রু অসুরদের নিধন করতে আদি শক্তি দুর্গার আবির্ভাবের কাহিনি। মহামায়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাস্ত্রকার চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭৫-৭৬ শ্লোকে বলেন, "দেবী আপনিই এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই এই জগৎকে ধারণ করে আছেন এবং আপনি একে পালন করছেন। প্রলয়কালে আপনিই একে গ্রাস করেন। আপনিই সৃষ্টির কারণ। পালন করার সময় স্থিতি হয়ে থাকেন, আবার প্রয়োজনে গ্রাস করেন।" অথচ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুযায়ী ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালন কর্তা আর মহাদেবকে ধ্বংসের কর্তারূপে বলা হয়েছে। যাইহোক, **পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী প্রায় পাঁচ হাজার বছর যুদ্ধেও যখন বিষ্ণু মধু-কৈটভকে হত্যা করতে পারেন না, কিন্তু তখন মহামায়ার মায়ায় অসুরদ্বয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেনা। তখন বিষ্ণু কৌশলে তাদের দু'জনকে হত্যা করলেন। একথা স্পষ্ট হলো যে, দুর্গার নারীসুলভ ছলনায় অসুরদ্বয়কে আচ্ছন্ন করতে না পারলে, বিষ্ণুর ক্ষমতা ছিল না তাদের হত্যা করার। এই হচ্ছে বিমুখ ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের রণ কৌশল।**

যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় বা প্রাগার্যদের কাছে হেরে রাজ্য থেকে বিতাড়িত, সেই হেতু মেধস মুনি রাজা সুরথকে দুর্গাপুজো করার পরামর্শ দেন। তখন বসন্তকাল। বসন্তকালে এই পুজো হয়েছিল বলে একে বাসন্তীপুজো বলে। মার্কণ্ড ঋষির শিষ্য ভগুরি এই কাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১৩নং অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। রাজা সুরথের সেই দুর্গামন্দির অনেক দিন গড় জঙ্গলের অন্ধকারে

পড়েছিল। অনেককাল পরে ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে এক সাধু জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেই মন্দির আবিষ্কার করে সেখানে পূজাপাট শুরু করেন। অনেকে মনে করেন, গড় জঙ্গলে রাজা সুরথের এই দুর্গামন্দির ও দুর্গা পুজো করার জন্য আজকের এই দুর্গাপুর শহরের নামকরণ। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল রাজা সুরথ কোল-আদিবাসীদের নিকট হেরেছেন। কোলদের একটি গোষ্ঠী এখনও 'অসুর' নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশে এবং উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বহু অসুর শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। মূলত গুমলা ও লোহার দাগা অঞ্চলে এদের বসবাস। এঁরা লোহা-মাটি বা আকরিক লোহা থেকে লোহা গলাতে পারেন এবং পূর্ব পুরুলিয়ার অসুর গোষ্ঠীর মানুষেরা তামাও গলাতে পারেন এবং বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করতে পারেন। পরবর্তীকালে এঁদের নাম ঝালদা ও বাঘমুণ্ডিতে অসুর-কামার নামে পরিচিত হয়। এই অসুর কামারদের তৈরি নানা লোহার দ্রব্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চাষের কাজের জন্য ব্যবহার করেন। ঋগ্বেদে আমরা অসুর শব্দটি নিয়ে বারে বারে বিরোধাভাস জানতে পারি। মজার কথা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য এক সময় অসুর বিশেষণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু পরে ঋগ্বেদে তাঁদের অসুরঘ্ন বা অসুর নিধনকারী বলা হল। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা থেকে জানা যায় যে, অসুর ছিলেন তাঁদের সর্বোচ্চ দেবতা। সংস্কৃতের 'স' ইরানীয়দের 'হ' উচ্চারণযুক্ত। এইভাবে ইরানের 'অহুর' ভারতে অসুর বলে পরিচিত। কিন্তু অহুর শব্দের এত বড়ো বিকৃতি হল কেন? আর্য আক্রমণকারীদের বারে বারে ভারতের প্রাগার্যরা প্রতিহত করেছেন। তাই অহুর শব্দটি পরবর্তীকালে অসুরে পরিণত হয়েছে। আজকের ঝাড়খণ্ডে এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ পশ্চিম বাংলার চা বাগানগুলিতে যে সমস্ত লোহাগলনকারী গোষ্ঠী আছেন তাঁরা অসুর বা চাপুয়া কামার নামে পরিচিত, যেহেতু তাঁরা ছিলেন অস্ত্র নির্মাতা,

তাই বলা যায় তাঁরাই ছিলেন আর্য আক্রমণ প্রতিরোধী জনগোষ্ঠী। আর্য আক্রমণের সময় তাঁরা জোট বাঁধলেন কৈবর্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে। কৈবর্ত গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ নেতাকে বলা হল 'মহামণ্ডলিকা' বা মহিষ। আর্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দেশজ মূলনিবাসীদের যে জোট হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দেন মহিষাসুর। অধ্যাপক পুরুষোত্তম চন্দ্র জৈন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ, সোশিও ইকনোমিক এক্সপ্লোরেশন অপ মিডিয়াভেল গ্রন্থে বলেছেন, 'ইন দি সেন রেজিম অফ বেঙ্গল, দি কৈবর্তস ওয়ার হাইলি রেসপেকটেড ইণ্ডিয়া ক্রোনিকেলস অফ দি টাইম রেফার টু এ বল্লাল সেন অফ বেঙ্গল, হু কনফারড দি ফিউডেটরি টাইটল অফ মহামণ্ডলিকা অর মহিষ, দ হেডম্যান অফ কৈবর্তস'। **ব্রাহ্মণ মুনি মেধস এক্ষেত্রে শত্রু নিধনের জন্য রাজা সুরথকে দেবী দুর্গার পুজোর পরামর্শ দিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্যহারা কোল বা আদিবাসী সমাজের কোনও উন্নতি হয়নি। বরং লুঠেরা-রাজ্য দখলকারী রাজা থেকে সুরথের উত্তরসূরীগণ আদিবাসীদের নিকট প্রণম্য। আর লুটেরা আর্যদস্যুদের মূল শক্তিদায়িনী দুর্গা কোল আদিবাসীদের ক্রমশ আরাধ্য দেবী হয়ে উঠেছেন। এটাই আজকের মূলনিবাসী প্রাগার্যদের ট্রাজিডি।**

দুর্গার জন্মের কাহিনি নিয়েও নানা মুনির নানামত। মার্কণ্ডেয় পুরানের ৮২ থেকে ৮৪ অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় উপাখ্যান অনুসারে, পুরাকালে এক সময় স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ও তাঁর দেব সেনাদের সঙ্গে মর্তের অর্থাৎ পৃথিবীর অসুরদের এক ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের নিকট শোচনীয়ভাবে হেরে গেল। প্রাণভয়ে দেবতারা যে যেদিকে পারল সেদিকে দৌড়ল। শেষে তারা ব্রহ্মার নেতৃত্বে শিব ও বিষ্ণুর কাছে এসে সব কথা খুলে বলল। তারা জানাল, অসুরদের রাজা মহিশা মহান অসুর বা মহিষাসুরের অত্যাচারে সকল দেবতারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মহান মহিশা অসুরের দৌরাত্ম্যের কথা বলতে বলতে ব্রহ্মা ও

দেবতারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এর ফলে, সকল দেবতার মিলিত ক্রোধ এক বিপুল তেজের আকার নিল। সেই তেজরশ্মি থেকে এক অদ্ভুত আলো উৎপন্ন হল। সেই তেজময় আলো ধীরে ধীরে এক নারীর চেহারা নিয়ে সামনে এসে আবির্ভূত হলো। এখানে দেবী দুর্গার জন্ম কুহেলিকাময় ধোঁয়াশা রয়ে গেল। ভাবলে লজ্জার বিষয় হয়ে উঠবে। এ'কথা হলপ করে বলা যায়। তাই দুর্গার জন্মের বিষয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দশজনে জন্ম দেওয়া কখনও ভালো ইঙ্গিত দেয় না। বরং নারীকে অসম্মান করা দেবতাদের এই স্বভাব চরিত্রকে দেশজ মূলনিবাসী মানুষেরা ভালো মনে নেয় না। দেশজ মানুষেরা নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখায়।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে, দেবী ভাগবতে এবং বামন পুরাণে বিভিন্ন দেবতাদের তেজে দেবী দুর্গার শরীর গঠনও বেশ চমকপ্রদ। মহাদেবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজ থেকে দেবীর কেশপাশ ও বিষ্ণুর তেজে বাহুগুলি তৈরি হয়। চন্দ্র-তেজে দেবীর স্তনযুগল, ইন্দ্র তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে তাঁর জিহ্বা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তার নিতম্ব তৈরি হল। ব্রহ্মার তেজে উদ্ভূত হল দেবীর পদযুগল। আর কুবেরের তেজে দেবীর নাসিকা। প্রজাপতির তেজে দাঁত এবং অগ্নির তেজে তিনটি চোখ উৎপন্ন হল। এরপর সন্ধ্যাদেবী-দ্বয়ের দ্বারা (সন্ধ্যাদেবী কখন দু'জন দেবী হলেন তা একমাত্র শাস্ত্রকাররাই জানেন) তৈরি হলো দেবীর কর্ণদ্বয়। অপরূপা এই নারীকে দেখে দেবতারা বুঝলেন, এই নারীর মধ্যে আছে সেই শক্তি, যা দিয়ে মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করা যাবে। জন্ম হল দুর্গার। এইভাবে যে কোনও জীবনের জন্ম হতে পারে তা কোনও বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস করবে না। প্রাণ জন্মানোর রসায়ন এ যুগের সকলে জানেন। তবু একদল মানুষ গদগদ হয়ে এ কাহিনি শোনেন এবং বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুর্গার নির্দিষ্ট কোনও পিতা-মাতা পাওয়া গেল না। একাধিক পুরুষের তেজে দুর্গার

জন্ম। তেজমানে শক্তি। শক্তি মানে বীর্য। কেউ যদি বলে একাধিক পুরুষের বীর্যে দেবী দুর্গার জন্ম তাহলে কি দাঁড়াল? পুরাণ শাস্ত্রকারেরা কি দুর্গার জন্মবৃত্তান্তকে লজ্জাকর পরিস্থিতিতে ফেলল না? দেবীকে সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান করা হল না? যাইহোক, জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো। দেবী দুর্গার কাজ কি? তবে মূল কাহিনি সেই অসুর নিধন। অসুর মানে যারা উন্নত অ্যাসিরিও সভ্যতার স্রষ্টা। এশিয়ার মূলনিবাসী বর্তমান ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন জনজাতি। এরপর মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দেবতারা নানান অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সাজালেন। মহাদেব দেবীকে একটি ত্রিশুল দিলেন, বিষ্ণু দিলেন একটি সুদর্শন চক্র। এভাবে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি ও পবনদেব একটি ধনু ও দু'টি বাণপূর্ণ তূণীর দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবীকে বজ্র, ঐরাবত ঘণ্টা, যম কালদণ্ড, বরুণদেব পাশা দিলেন। সূর্য দেবীর সমস্ত রোমকূপে তার তেজ এবং কাল-দেবতা দেবীকে খড়্গ ও ঢাল দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। সমুদ্রের কাছ থেকে দেবী সমস্ত অলংকার পেলেন। বিশ্বকর্মা দেবীকে কুঠার ও নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র দান করলেন। সমুদ্র দেবীকে দু'টি পদ্মমালা ও একটি পদ্ম দিলেন। হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন সিংহকে, কুবের দিলেন সুরাপূর্ণ পাত্র। সবশেষে নাগরাজ বাসুকি দেবীকে মূল্যবান মণিশোভিত নাগহার দেন। এখানে দেবতারা মানে অভিজাত্য বর্ণবাদীরা তাদের শত্রু পরাক্রমশালী অসুর নিধন করার জন্য নারীকে কাজে লাগালেন। নারীরা দেবতাদের অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগতে বাধ্য হলেন। দেবতারা একালের কালিঘাট-সোনাগাছির মত ঊর্বশী-মেনকাদের তৈরি করলেন। সেকালের ধনবান, ক্ষমতাবানদের মতো একালের অর্থশালী মানুষেরা ভোগবাদে লিপ্ত থাকেন।

বামন পুরাণ মতে দেবতাদের তেজরাশির সাথে ঋষি কাত্যায়নের তেজ মিলিত হয়েছিল বলেই তাঁর নাম হয় কাত্যায়নী দুর্গা। তার মানে শুধু দেবতারা তেজ দিয়ে দুর্গাকে বানাননি। সুযোগ পেয়ে ঋষিরাও তেজ দিতেও লজ্জা বোধ করেনি।

একালের অসহায় নারীদের আশ্রমে পাঠানোর মত। সেখানেও নারীরা সংরক্ষিত নয়। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। নর মাংস লোভী মানুষের রক্তচক্ষু তাদের হজম করতে হয়। তাদের বিষাক্ত দাঁতের ও নখের আচড়ে পেটে ও পিঠে ঘা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তাই বহুক্ষেত্রে সেখানেও নারীরা নিরাপদ থাকেন না। আবার ভিন্নমতে, শরীর প্রাপ্তির পর সু-উচ্চ পর্বতে তপস্যারত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবী আবির্ভূতা হওয়ার কালে ঋষি কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেছিলেন বলেই তাঁর নাম কাত্যায়নী দুর্গা হয়। ভিন্ন মতে, মনুর পুত্র মানব, সুমিত্রার নন্দন সৌমিত্রি অনুসারে ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নীও হতে পারেন।

দুর্গা নামের অন্তরালে আর একটি মত হল, দুর্গ বা দুর্গম নামের এক অসুরকে বধ করেন বলেই এই নৃত্য পটীয়সী নারীর নাম হয় দুর্গা। দুর্গ ছিলেন রুরু দৈত্যের সন্তান। মহাশক্তিধর দুর্গ ত্রিলোক (ধর্মীয় ভাষায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বলতে বোঝায়—বর্তমান জম্মু-কাশ্মীর, কাবুল-কান্দাহার, পাকিস্তান, আফগানিস্থান প্রভৃতি সহ হিমালয় পাদদেশ পর্যন্ত হল স্বর্গ, হিমালয় পাদদেশ থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত মর্ত, আর বিন্ধ্য পর্বতের পরবতী অঞ্চল পাতাল নামে পরিচিত) বিজয়ী হন। **দেবতাদের জব্দ করার জন্য বেদকে কুক্ষিগত অর্থাৎ বেদ নিষিদ্ধ করেন। বেদ অসুর রাজ দুর্গম দ্বারা কুক্ষিগত হওয়ায় জগতের যজ্ঞকার্য বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যজ্ঞ করে না, দেবতারা আর যজ্ঞের ভাগ পায় না। যজ্ঞের ভাগ না পেয়ে অকর্মন্য শ্রমবিমুখ দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করবার মত কোনও শক্তিই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রইল না।** অর্থাৎ ফুঁক-ফাঁক, মন্ত্রতন্ত্র প্রিয় পরগাছা দেবকুলের কাজ না করে খাওয়ার অবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে, অলস বিলাস প্রিয় দেবকুল অসহায় হয়ে পড়লেন। ফলে দেবকুলের কাতর প্রার্থনায় দেবী জাগ্রত হলেন। নানান সমস্যা থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন। বলা

যায় দেবতাদের দুর্গতি থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে দেবীর নাম হয় দুর্গা। আবার কোন কোন ধর্ম শাস্ত্রে একথাও বলা হয়েছে যে, দেবতাদের অনুরোধে পার্বতী দুর্গকে হত্যা করেন এবং দুর্গা নামে পরিচিত হন।

এখানেও দুর্গা দেবতাদের মঙ্গলের জন্য অসুর বা প্রাগার্য মূলনিবাসী সমাজের দুর্গ নামে এক বলশালী ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এখানেও দেবী কাত্যায়নী বা দুর্গার পিতা-মাতা কে জানা গেল না। তবে কাত্যায়নী বা দুর্গা এখানে দেবতা বা সুর (সুরা নারীতে আসক্ত যারা) বা আর্যদস্যুদের হিতার্থে মহিষাসুরকে বধের জন্য সৃষ্টি, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। মহিশা অসুর আর কেউ নয়, দেশজ বলশালী সম্রাট। যেহেতু মহিষ তাঁর বাহন, তাই পরবতীকালে শব্দের সংকোচনে মহিশা অসুর বা মহিষাসুর নামে পরিচিতি লাভ করে। মহীসুর বা মহিষাসুর বা মহিয়স অসুর বা মহিশা অসুর, যে নামেই বলি না কেন, ওই একজনকেই বোঝায়। তবে 'হুদুড় দুর্গা' আর এক বলশালী নেতা। তার জীবনও কম ঘটনা বহুল নয়। বানর, রাক্ষস নাগ প্রভৃতি শব্দ নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। নানা মুনির নানা মত কম-বেশি উল্লেখ করা হল। যেমন—'বানর' ও 'রাক্ষস' কারা এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আর্যগণ সে সময়ে ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসীদের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে বানর নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত বানর অর্থাৎ বন্যজাতিদের মধ্য যাঁহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত, তাঁহারা আর্যগণ কর্তৃক রাক্ষস নামে অভিহিত হইত।

মহিষাসুরকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়েছে যে তিনি অশুভের প্রতীক। মহিষ ও অসুর শব্দ দুটি নিয়ে তৈরি হয়েছে মহিষাসুর শব্দটি। আর্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহিষাসুর নামের এক যৌথ বা জোট নেতৃত্ব। সমস্ত মধ্যভারতের মানুষদের সর্বপ্রধান বংশপ্রতীক হল 'নাগ'। বিশেষ সংকটমুহূর্তে

নাগ রক্ষা করবে পরিবারের সমস্ত মানুষকে—এটাই তাঁদের বিশ্বাস। সর্পের যেমন মারাত্মক মারণশক্তি আছে, তেমনি আছে বিশ্বাস রক্ষাশক্তি। সর্পের এই রক্ষা শক্তি থেকেই রক্ষস শব্দটি রাক্ষস-এ পরিণত হয়েছে। সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে সর্প সর্ববিদিত এক পুরাণ আলেখ্য। ভারত উপমহাদেশের মন্দিরগুলোর বিভিন্ন গুপ্ত কক্ষে রাশি রাশি হীরে, জহরত, স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে, তা পাহারা দেওয়ার জন্য সর্প বা নাগের চিত্র বা মূর্তি গড়া রয়েছে। নাগ বা সর্প এই মূল্যবান ধন-সম্পদ রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ যেমন কালিয়া নাগকে হত্যা করেছিলেন, তেমনি নাগও তাঁকে রক্ষা করেছেন। সমুদ্রমন্থনের সময় বাসুকি শেষ নাগের অবদান অনস্বীকার্য। গৌতম বুদ্ধকে রক্ষা করেছিলেন 'মুচলিন্দ' নামে এক নাগ। প্রতিটি কাহিনিতে দুর্গাকে দিয়ে দেবকূল রক্ষার্থে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ দিয়েছেন। সেই মত অ্যাসিরিও সভ্যতার ধারক-বাহক বলবান অসুরদের হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কথা অতীব সত্য যে, দীর্ঘকাল ধরে আর্যদস্যু ও সুসভ্য সিন্ধু নগরবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ চলেছিল। পণ্ডিতেরা এই বিরোধ ও যুদ্ধকে আর্য-অনার্য যুদ্ধ বলেছেন। ধর্মীয় শাস্ত্রকারেরা এঁকে দেবতা (আর্যদস্যু) ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আর্য-প্রাগার্য যুদ্ধেরই প্রতীক। যে কোল দেশের দেশত্যাগী রাজা সুরথের কাছে মেধাস ঋষি দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, ছোটনাগপুরের বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও সেখানে কোল জাতির লোকেরা বসবাস করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে এবং মানুষের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং মা-ঠাকুমার উপকথায় বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, বিন্ধপর্বত কোলে মেধাস মুনীর আশ্রম মেলে। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র "পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছেন। অসুর শম্বরের অর্থাৎ শবরের নিরানব্বইটি পুরী ধ্বংস করেছেন" (২/৭/২-৩)। ঋগ্বেদে (১/৫৩/৭) একথাও আছে যে, "শম্বরের

নগর সমূহ ধ্বংস করে" পুরন্দর নামে অভিহিত হন। এই আর্য-প্রগার্য যুদ্ধে এ দেশের বহু নগর, পুরী ও জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। প্রাক-আর্যযুগে সিন্ধু ভারতীয় নারীরা যোদ্ধা ছিলেন। আর্য যুগে তাঁদেরও কোনও কোনও নারী যোদ্ধা ছিলেন একথা ঋগ্বেদ স্বীকার করে। একথাও অনুমান করা যায় যে, দুর্গ রক্ষাকারিণী শম্বর নারী যোদ্ধাদের উৎস হিসাবে নিয়ে আর্যরা যুদ্ধের দেবী দুর্গার কাহিনি গড়েন। কেননা, আর্য সমাজে নারীর কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সমাজ ব্যবস্থায় আজও নারীর সে মর্যাদা চোখে পড়ে না। ভালো রেজাল্ট করতে গেলে মেয়েদের কলেজ শিক্ষকদের বিছানায় সময় দিতে হয়। চাকরি বা চাকরির পদ উন্নতি ঘটাতে গেলে শরীরের চোঁয়া দান করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কর্তাদের নোংরা তেজ ধারণ করতে হয়। এসব কথা বলতেও আমার রুচিতে বাঁধে।

এবার যে কাহিনি উল্লেখ করব তার নাম 'অকাল বোধন'। এই অকাল বোধন বা শরৎকালীন দুর্গোৎসবই সবচাইতে জাঁক-জমকপূর্ণ। বর্তমানে হিন্দু বাঙালির প্রায় জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। রাজা সুরথের বসন্তকালের পরিবর্তে আশ্বিন মাস বা শরৎকালে অর্থাৎ অসময়ে বা অকালে রামচন্দ্র এই পূজা করেছিলেন বলে দুর্গাপুজো 'অকাল বোধন' নামে পরিচিত।

লঙ্কাধিপতি রাবণকে বধ করবেন বলে রামচন্দ্র দুর্গার অকাল বোধন ঘটিয়ে পুজো করেছিলেন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী অবধি সেই বোধন ও পুজোর পর্ব পার হয়ে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে তিনি সন্ধি পুজো করলেন। দুর্গা তুষ্ট হলেন, রামকে বর দিলেন। দেবী দুর্গার বরে রামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণকে বধ করলেন।

রামচন্দ্রের এই দুর্গাপুজো কৃত্তিবাসী সংযোজন। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও দুর্গার নাম নেই। রামায়ণের কাহিনি যে সময়ের সে সময়ে দুর্গার আবির্ভাব ঘটেনি। রামায়ণের সময়কালের কয়েকশত বৎসর পরের ঘটনা দুর্গার আবির্ভাবের কাল।

বাল্মীকি রামায়ণের রাম দুর্গাপুজো করেননি। তিনি সূর্যপুজো করেছিলেন। মহাশক্তিশালী মহারাজ রাবণকে যুদ্ধার্থী দেখে রামচন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। সূর্যবংশজাত রামচন্দ্রকে চিন্তান্বিত দেখে ঋষি অগস্ত্য আদিত্য হৃদয় সূর্যদেবের পুজো করতে আদেশ দেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌরবঙ্গের রাজা গণেশের নির্দেশে বাংলার কবি (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া নিবাসী) কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণেই শরৎকালে দুর্গার অকাল বোধনের কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়। ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজিকে দিয়ে বাংলায় যে ইসলামি শাসনের শুরু, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলায় তার সমাপ্তি ১৭৫৭ সালে। ৫৫৪ বছরের মুসলিম-প্রশাসনের মধ্যে গণেশই ছিলেন একমাত্র হিন্দু রাজা। রাজা গণেশের প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং স্বধর্মের প্রতি চরম আনুগত্য ছিল সুপরিচিত। পরধর্মের প্রতি বিরাগ ও নিজধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও ভালবাসাই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবক্ষয়ের কালে তাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

দুর্গাপুজোর কাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও মার্কন্ডেয় চন্ডীতে জানা যায়, সুরথ রাজা শরৎকালেই দেবী দুর্গার পুজো করেছিলেন। ষোড়শ শতকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত আকারে বঙ্গদেশে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও (৬৪ ও ৬৫ অধ্যায়) শরৎকালেই দুর্গাপুজোর কথা বলা হয়েছে। সম্রাট আকবরের আমলে রাজা কংসনারায়ণ বঙ্গদেশের দেওয়ানের পদে উন্নীত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর, জমিদারি বিস্তার করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রানুমোদিত কোনও মহাযজ্ঞ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজা কংসনারায়ণকে বলেন, "শাস্ত্রে বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেদ এই চারটি মহাযজ্ঞের বিধান আছে।

তবে প্রথম দু'টি সার্বভৌম সম্রাট করতে পারেন। পরের দুটি কলিতে নিষিদ্ধ। উভয় যজ্ঞই ক্ষত্রিয়দের করণীয়। ব্রাহ্মণের নহে। কলিতে একমাত্র মহাযজ্ঞ দুর্গাপুজো। যে কেউ এই মহাযজ্ঞ দুর্গাৎসব করতে পারেন। আসলে, নারী ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের অমানবিক নীতি। খৃষ্ট পূর্ব থেকে ধুরন্ধর ধর্মীয় গুরু ও রাজন্যবর্গরা "বিষকন্যা" হিসেবে নারীদের ব্যবহার করে এসেছে। বাল্যবেলা থেকে নারীকে সামান্য পরিমানে বিষধর সাপ জাতীয় জীবের বিষ খাওয়ানো হয়। একটা সময় ওই নারী অনেকটা বিষ হজম করতে পারে। বলাভালো, নারীর শরীর বিষময় হয়ে পড়ে। নারীর যৌবন কালে আক্রমণকারীকে লোভ দেখিয়ে ওই বিষাক্ত নারীকে ব্যবহার করা হত। ওই বিষকন্যা নারীর ওষ্ঠ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনরত পুরুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। যাইহোক, প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচ করে রাজা কংসনারায়ণ এই মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসব প্রচলন করেন। প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে দেখা যায়—রাজা কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজশাহী জেলার ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ করে বাসন্তী দুর্গাৎসব করেন। গরীবের রক্ত চোষা অর্থের এই ভন্ডামী ও চরিত্রগত বেলাল্লাপনার ব্যবহার করত, তৎকালীন বেশিরভাগ জমিদার-জোতদারগণ। পরবর্তীকালে এক রাজার (জমিদার বা বারভুঁইয়া বা ধনী ব্যবসায়ী) দেখাদেখি আর এক রাজা এই পুজো পাল্লা দিয়ে করতে থাকেন। মনে রাখা দরকার; কৃত্তিবাসের রামায়ণেও অসুররাজ লঙ্কেশ্বর রাবণকে হত্যার জন্য রামচন্দ্রের দুর্গাপুজো। যদিও গল্পটা মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসের বানানো। সেই একই প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্যবাদী রামচন্দ্রকে দিয়ে এদেশিয় মহাশক্তিশালী ভূমিপুত্র (মুন্ডারি বা দ্রাবিড় সম্রাট) সম্রাট রাবণকে হত্যার কাহিনি।

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যায়। কেবল যখনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা পায়, তখনই সর্বদিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার, প্রসার ঘটে যা দেশীয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভন্ড মুনী-ঋষীরা তো পরিশ্রম করে না। দেশজ শ্রমজীবীদের ফসল ভোগ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারজন্য ঈশ্বর-গড-আল্লা সৃষ্টি। তারা ভয় দেখিয়ে ব্রাহ্মণ-পোপ-মোল্লারা সব ভোগ করে। চরম ভোগবাদে ডুবে থাকে তার উত্তর পুরুষেরা। প্রথম হুন আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষিত হলেও রাজা হর্ষবর্ধনের বিশাল সাম্রাজ্যে আবার বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। এসময় পূর্ব ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটায়। শশাঙ্কের রাজত্বকালে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করলেও পাল সাম্রাজ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে পশ্চিম ভারতে গুর্জ্জর প্রতিহার রাজারা এবং দক্ষিণ ভারতের চোল, চের, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বজায় রাখতে সফল হন। **বাংলায় পাল যুগে এসে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহাবস্থান ঘটে। এই দুই প্রধান রাষ্ট্রীয় ধর্মের ফারাক সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম হন।** কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের সহজাত মানবিক ধর্ম ওই দুই রাষ্ট্রীয় ধর্মের বাইরে প্রবহমান থাকে। যেহেতু সাধারণ মানুষের চলমান সাম্যবাদী সমাজ ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, সেহেতু কালক্রমে তা জনমানস থেকে প্রায় হারিয়ে যায়। কেউ কেউ সনাতন ধর্মের নামে কিছু অনুশাসন প্রচার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের নামে এই নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কেউ গ্রহণ করেনি। গৌতম বুদ্ধ স্বধর্ম বা সনাতন ধর্মের মানুষ ছিলেন। সম্রাট অশোকও সনাতন ধর্মের উপাসক ছিলেন। অবশ্য তিনি বুদ্ধের মত ও পথকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার

ঘটিয়েছিলেন। **বুদ্ধ তাঁর ধর্ম আকাশ থেকে পাননি। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের জীবনবোধ থেকে, প্রবাহমান শ্রমজীবী সাম্রাজ্যের জাগ্রত সাম্যবাদী মতাদর্শ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দ্রুত ব্রাহ্মণ্য ভারত বৌদ্ধ ভারতে পরিণত হয়েছিল।** যুক্তি ও মানবিক বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশঃ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু বৌদ্ধ অনুশাসন সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে ক্রমাগত সনাতন ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের পক্ষে রাষ্ট্রীয় আক্রমণের মাধ্যমে মূলনিবাসী মানুষের ওপর বিরামহীন অত্যাচার চলে। ফলে, গোটা দেশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একদিকে বৌদ্ধ অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই দুইয়ের বিভ্রান্তির মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর শ্রমজীবীদের পালনীয় ধর্মের খোঁজ করেছিলেন। বলা যায়, চলমান কৃষিজীবী শ্রমজীবী নমদের জীবনচর্চা ও জীবনবোধ প্রচার করার কঠিন চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৌশলী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মতুয়া মতাদর্শের অনকেটাই গ্রাস করে ফেলেছে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে। এদেশের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে ব্রাহ্মণের চিরদাসত্বে অবনত করে রাখার জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে হিন্দু ধর্ম বলে চালানো হয়। তা না হলে, হিন্দু ধর্ম বলে তো কোন ধর্ম নেই। বৃটিশ শাসনকালের প্রথম দিকেও মূলনিবাসী মানুষদের প্রতি ভয়ংকর নির্যাতন ও ঘৃণা সূচক দৃষ্টি ছিল। একটা সময় মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বুঝতে পারল যে, তাদের এই ভূ-খণ্ডে সুন্দর জীবন যাপন করতে গেলে, রাজশক্তির সঙ্গে মিশে চলতে হবে। তারা ক্রমশ শিক্ষায় ও রাজনীতিতে শক্তিশালী হতে লাগল। ভয় পেয়ে গেল বামুনেরা। তারা তাদের আর্য-ব্রাহ্মণ শব্দের অহংকার ও প্রচার কমিয়ে দিয়ে দেশজ মানুষদের রাজন্যবর্গরা যে 'হিন্দু' শব্দে গালি দিত; তা গ্রহণ করল। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য 'গর্বের সঙ্গে বলো—তুমি হিন্দু' এই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। একটু পিছনের দিকে তাকালে একথা

স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল বৌদ্ধ ও চার্বাকদের প্রবল চাপের মুখে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক ক্ষেত্রে সহনশীল হল। আর আর্যদস্যুরা তাঁদের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে সনাতন ধর্মমতে চলল। মুসলমান শাসকেরা এদেশ দখল করার পর ইসলাম ধর্ম ছাড়া বাকিদের হিন্দু বলে উল্লেখ করলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পণ্ডিতেরা সনাতন ও ব্রাহ্মণ্য শব্দ দুটিকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম নামে ব্যাপক প্রচার করল। তাই বর্তমান হিন্দুধর্ম যা, ব্রাহ্মণ্যধর্মও তাই। বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারে মুসলমান শাসনের পূর্বেই ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ ঘটেছে। অন্যান্য ধর্মের মানুষ তাদের দর্শন হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে, হিন্দু শব্দের গোলক ধাঁধায় পড়ে সকল মানুষ ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত জাত-ধর্মের গোলক ধাঁধা।

আর্যরা একটি মদ্যপ জাতি। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, কাব্যচর্চা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মদ তাদের ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বৈদিক দেবতারা মদ্যপান করতেন। স্বর্গীয় মদকে বলা হত সোমরস। প্রাচীন আর্যদস্যুদের নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে খুব কমদিনই যেত যেদিন তাদের সোমরস পান করা হত না। আর এ কথা কে না জানে? নেশাকারীদের চরিত্র দোষ ঘটে। দেবতারা সবাই যে ভালো চরিত্রের ছিল তা কিন্তু নয়। ধর্ম যারা পালনের নামে ভোগী হয়, তাদের বাস্তব জীবন দেখলে; অনেক সময় ঘৃণাবোধ জন্মে। তাদের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির ও লজ্জাজনক। মানুষের বাস্তব জীবনের উন্নতির লোভ দেখিয়ে এবং পরকালের স্বর্গ সুখের লোভ দেখিয়ে, মানব ধর্মের অপমান করে। মুক্ত মনের মানব ধর্মকে লজ্জার করাল গ্রাসে নিম্ন করে। মানুষের সোমরস পান তিনটি উচ্চ শ্রেণি যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

যজুর্বেদ বলছে 'হে সোমদেব! সুরাপানে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে পবিত্র মনন দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট কর; যজ্ঞকারীকে কিছু রসালো খাদ্য দাও এবং ব্রাহ্মণ

ও ক্ষত্রিয়কে দাও প্রাণশক্তি'। মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বলছে : 'যার দ্বারা মহিলাদের পুরুষের উপভোগ্য করা হয়েছে এবং যার দ্বারা জলকে মদে পরিণত করা হয়েছে (পুরুষের আনন্দের জন্য) ইত্যাদি'। রাম ও সীতা উভয়েই যে মদ্যপান করতেন, সেকথা রামায়ণে স্বীকার করা হয়েছে। উত্তরখণ্ডে বলা হচ্ছে ঃ 'ইন্দ্র যেমন তাঁর স্ত্রী শচীর ক্ষেত্রে করেছিলেন, রামচন্দ্র সীতাকে বিশুদ্ধ মধু থেকে প্রস্তুত মদিরা পান করালেন। ভৃত্যেরা রামচন্দ্রের জন্য মাংস এবং সুমিষ্ট ফল নিয়ে এল'। একই কাজ করেছিলেন কৃষ্ণ এবং অর্জুন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে সঞ্জয় বলছেন : 'অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ সোমলতা থেকে প্রস্তুত মদিরা পান করে, সুগন্ধি মেখে, মাল্যভূষিত হয়ে জমকালো পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করে বিবিধ রত্নখচিত একটি স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন হলেন। আমি দেখলাম শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল অর্জুনের কোলের উপর এবং অর্জুনের পদযুগল দ্রৌপদী এবং সত্যভামার কোলের উপর'। আর্য দেবতাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন সুরাপানে বিশেষজ্ঞ। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রের চরিত্র বড়ই নিষ্ঠুর। নারীঘটিত স্বভাব মুখে বলা যায় না। বৈদিক যুগের মুনি-ঋষি ও রাজা-মহারাজা যজ্ঞকালে সোমরস অর্থাৎ সুরা হব্য হিসেবে অগ্নিতে প্রদান করতেন, বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে। দেবী দুর্গাও সুরাপানে আসক্ত ছিলেন। আমরা যদি মহালয়ের দিনে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখি, তবে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মদ-মাতাল রমণীকে কোন মানুষই শ্রদ্ধা করেন না।

আদি বাল্মিকি রামায়ণের মতো আদি বেদব্যাসী মহাভারতের কোথাও কোনও দেবী পুজোর উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদে দেবী দুর্গার আরাধনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্যভ্রষ্ট যুধিষ্ঠিরের 'ভগবতী দুর্গার স্তব'-এ দেখা যায় যে, দুর্গা এখানে যশোদার কন্যা, মদ মাংস প্রিয়া, কামচারিণী। দুর্গা এখানে দশভূজার পরিবর্তে চতুর্ভুজা। ভীষ্মপর্বের ২৩ অধ্যায়ে

দুর্যোধনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে অর্জুন দেবী দুর্গাকে কুমারী, নন্দ গোপকূলে জন্ম, কোকামুখ অর্থাৎ কুকুরের মতো মুখ বলে সম্বোধন করেছেন। মহাভারতের লেখক দেবী দুর্গাকে কুকুরের মতো মুখ বলতেও দ্বিধা করেননি। এক এক ধর্ম পুরাণ, এক এক ভাবে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। দুর্গার রূপ যে ঠিক কেমন তা বোঝা দুষ্কর।

মহালয়া থেকে বিজয়াদশমী এই পর্বটিই দুর্গাপুজো। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশি নবরাত্রি রূপে উৎসব পালিত হয়। গুজরাতে ডাণ্ডিয়া রাস ও নর্বা নৃত্য সহযোগে নবরাত্রি পালিত হয়। গোয়াতে এই সময় সেজে ওঠে সারস্বত ব্রাহ্মণী মন্দিরগুলি। দক্ষিণ ভারতে এই সময় ধাপে ধাপে দেব-দেবীর মূর্তি সাজিয়ে পালিত হয় 'গোলু'। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে যে মূর্তি কাঠামোয় পুজো দেওয়া হয়, সেখানে সকলের অলক্ষ্যে থাকেন দশভূজা দুর্গার স্বামী হিসেবে শিব বা মহাদেব। শিবের আর এক স্ত্রী হিসাবে কালী সর্বাধিক প্রচারিত। অথচ কালী হলেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদি মানবী। সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদের 'রাত্রিসূক্ত' বৈদিক যুগের 'রাত্রিদেবী' সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কালী নামে পূজিতা। কালী আর দুর্গা এক নন। কালীর সমকালে সমাজে লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়নি। তাই কালীর লজ্জা নিবারণের কোনও পোশাক নেই। যদিও মানুষ প্রথম লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক ব্যবহার করত না, পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পশুর চামড়া, গাছের বাকল ব্যবহার করত। তবে কালী মানুষের মাথা ও হাত কেটে যেভাবে পোশাক পরিধান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রতীকী অর্থে লজ্জা নিবারণের জন্য। আর্যদস্যু ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ আক্রমণকারীরা এদেশের শুধুমাত্র সম্পদই লুণ্ঠন করত না। নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করত। এই অমানবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এদেশের যোদ্ধা নারীরা নিজেরাই দুষ্টুকে শাস্তি দিতেন। ফলে, দুষ্ট বা খারাপ কারা? অসুর অর্থাৎ সুরা-নারীতে যারা আসক্ত

বা নেশাগ্রস্থ নয় তারা? নাকি সুরা অর্থাৎ সুর-নারীতে যারা আসক্ত বা নেশাগ্রস্থ তারা? দেশীয় নারী যাযাবর-অত্যাচারী তৎকালীন বিদেশীদের হত্যা করে, নারী তার লজ্জা নিবারণ করেন। যাইহোক, পোশাক ও অলংকারেও দুর্গা ও কালীর মধ্যে কোনও মিল নেই. রেশম বা পশম শিল্পের শাড়ী বা সিল্কের শাড়ী পরিধেয় দুর্গা। জন্মগত, বংশগতভাবে দু'জনের দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। শিব বা মহাদেব কালী থেকে কয়েক হাজার বছরের ছোট। সমাজে লজ্জাবোধ এসেছে পরে। শিব এই কারণে বাঘ বা পশুর চামড়া ব্যবহার করেন। কালী-শিব-দুর্গার একসঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অথচ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই তিনজনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক করে দিয়েছেন। মানে, শাস্ত্রে মাতলামো করার কোন দরকার থাকতে পারে। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে খানিকটা ধোঁয়াশা ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারলে কেল্লা ফতে। ধর্মীয় ব্যবসা জমজমাট।

দুর্গাপুজোর যে চিত্র দেখা যায় তা হল—দুর্গা মহিষাসুরকে ত্রিশূল দিয়ে খুন করছেন। পাশে নানা জীবজন্তু (বাহন) সহ গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। সব কাঠ পুতুল মত।

সংস্কৃতে প্রবাদ আছে—'মাঘস্য শুক্র পঞ্চমাং বিদ্যারম্ভে দিনেপি চ' শ্রীকৃষ্ণই এই প্রথার স্রষ্টা। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ওই দিনেই স্কন্দের বা কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কার্তিক ও লক্ষ্মীর সম্পর্ক কি দাঁড়াল? স্বামী-স্ত্রী। অথচ দুর্গাপুজোয় কার্তিক ও লক্ষ্মীর সম্পর্ক ভাই-বোনের। কালক্রমে লক্ষ্মীর ওই দিনটি সরস্বতী দখল করে নিয়েছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লক্ষ্মী এবং দুর্গাকে এক করার প্রচেষ্টা করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। দুর্গাপুজোর সময় তেলেঙ্গানা বলয়ে 'বাথুকাম্মা' উৎসব পালন করা হয়। কথিত আছে, চোল বংশীয় রাজা ধর্মগণ্ডা কন্যা রূপে দেবী লক্ষ্মীকে লাভ করেছিলেন। এই রাজকন্যা বাথুকাম্মাই লক্ষ্মী আবার দুর্গা-ই। কেরলে দুর্গাপুজোর

সময়ে সরস্বতীর পুজো হয়। বড্ড জগাখিচুড়ি দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে।

ঋগ্বেদে সরস্বীতর উল্লেখ আছে। সেখানে সরস্বতী সূর্যের কন্যা ও পত্নী দুই-ই। আবার দেবী পুরাণেও সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা ও পত্নী দুই-ই। তাহলে এই সকল পুরাণ থেকে আমরা কী পেলাম? পেলাম মাথা আর মুণ্ডু। অর্থাৎ মস্তিষ্ক গুলানো কাহিনী। সবই দেব-দেবী মাহাত্ম! মদ্দাকথা, বইপত্র পড়ে না। বুঝতে চেয়েও না। শুধু অন্ধের মত বিশ্বাস কর। তাহলে তোমার মনে দেবদেবী সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে সরস্বতী নিঃসৃত হয়েছিলেন। পরে ক্রোধবশত বিষ্ণুর অন্য স্ত্রী গঙ্গার অভিশাপে সরস্বীত নদ বা নদী হলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল। অসুর সভ্যতা ধ্বংস করে আর্যদস্যুরা ভারতে প্রবেশের প্রথম দিকে এই নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। তখন অবশ্য সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উভয় পার্শ্বে উন্নত সিন্ধুসভ্যতা ছিল। সেখানকার মানুষ উন্নত নাগরিক জীবন-যাপন করত। **সরস্বতী নদী তার গতিপথ হারিয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে, এমন সময় আর্যরা সরস্বতী নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। আর্যদের আসার পূর্ব থেকে নানা কারণে সিন্ধুসভ্যতা ভেঙে পড়েছিল। আর্যদের আগমনে এবং তাদের ক্রমাগত আক্রমণে সিন্ধুসভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র সিন্ধু শব্দটি হিন্দু শব্দে বিদেশীদের কাছে থেকে যায়। আর্যরা এই গোটা সিন্ধু অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে। এইসব অঞ্চল আর্যবর্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের সভ্যতা আর্যসভ্যতা, তাদের ভাষা আর্যভাষা নামে চলতে থাকে।** এদেশের মানুষ এই আর্যভাষীদেরজীবন-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রাধান্য মানতে যেমন বাধ্য হয়, তেমনি সিন্ধু বা হিন্দুবাসীদের অনেক কিছু আর্যরা গ্রহণ করে। বিরোধ ও ভাব-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্যে থেকে এই সভ্যতা

গড়ে ওঠে। পরবতীকালে মুসলমান যোদ্ধাদের কবলে পড়ে, সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা শব্দ দুটির পরিবর্তে পারসিকদের কাছে পরিচিত শব্দ ‘হিন্দুসভ্যতা’ অধিক প্রচারিত হয়। বৈদিক যুগে সরস্বতীর প্রতিমা ছিল না। হীনযানী বৌদ্ধদের মধ্যে সর্বাস্তবাদী বৌদ্ধরাই প্রথমে বুদ্ধের মূর্তি সৃষ্টি করেন। তাঁদের দেখাদেখি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য দেবীদের মূর্তি বুদ্ধদেবের মূর্তির ন্যায় পরিকল্পিত বা গঠিত হয়েছিল।

কার্ত্তিক এবং গণেশের মধ্যে কে বড়? এই শাস্ত্রকারদের মধ্যে তর্কের শেষ নেই। শাস্ত্র বিচারে, কার্তিক আর গণেশের মধ্যে গণেশ বড়। কেননা, ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের ২৩তম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ‘গণপতি’ শব্দের উল্লেখ আছে। কার্তিকের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১১তম সূক্তের নবম মন্ত্রে ইন্দ্রকে এবং অন্যত্র রুদ্রকেও ‘গণপতি’ বলা হয়। তাই বলা যায়, যিনি ইন্দ্র, তিনি রুদ্র বা শিব। যিনি শিব তিনিই গণপতি বা গণেশ। ঋগ্বেদ অনুযায়ী দুর্গা গণেশের স্ত্রী, অথচ শারদীয় দুর্গাপুজো অনুযায়ী আমরা জানি দুর্গা গণেশের মা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বড়ই আশ্চর্য এবং অদ্ভুত সম্পর্ক দুর্গা ও গণেশের। ধর্মাশাস্ত্র নামে, শাস্ত্র পণ্ডিতদের এই ছেলে মানসিকতা বড়ই লজ্জার। মা-সন্তানকে স্বামী-স্ত্রী বা স্বামী স্ত্রীকে মা-সন্তান বানাতে এরা নির্লজ্জ পটু। আবার দুজন ভিন্ন সময়ের হওয়া সত্ত্বেও যে কোন সম্পর্কে জুড়ে দিতে এরা সিদ্ধ হস্ত। ঋগ্বেদের ১০/১২/৯ মন্ত্রে ইন্দ্রকেই গণপতি বলা হয়েছে। গণেশের জন্ম বিষয়ে পুরাণাদিতে পরস্পরবিরোধী একাধিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বামন পরাণ, বরাহ পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। তুলসী গণেশকে প্রেম প্রস্তাব দিলে, গণেশ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে, তুলসী ক্ষেপে গিয়ে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে না চাওয়া গণেশকে অভিশাপ দেন। কিছুকালের মধ্যেই গণেশ পুষ্টি নামে অর্থাৎ মহাষষ্ঠীকে বিয়ে করেন। আর গণেশের অভিশাপে তুলসীর শঙ্খচূড়

নামে এক অসুরের সঙ্গে বিয়ে হয়। কথিত আছে, গণেশ চোর ছিলেন। একবার চুরি করে জননী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। গণেশের বাহন মুষিক বা ইঁদুরের স্বভাবও চোরের মত। যেমন—'মূষ' শব্দটির অর্থই হচ্চে লুণ্ঠন বা চুরি করা। খেতের ধান, গৃহের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য তথা ছোটখাটো গৃহ উপকরণ নিত্য নিত্য চুরি করাই তার উপজীব্য। কাঁচা ঘরের মেঝেয় ও দেওয়ালে সিঁদেল চোরের মত সিঁধ কাটে। যতটা পারে পেট পুরে খায়। অবশিষ্ট নিজের গর্তে লুকিয়ে রাখে। যা তার খাদ্য নয়, সেগুলি কুচি কুচি করে কেটে তছনছ করে, নষ্ট করে। গণেশ আর তার বাহন ইঁদুর ঠিক যেন, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। আসলে কথায় বলে না বাপ কা বেটা, সেপাই কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। গণেশের বাবা শিবকে যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে চোরের সর্দার বলা হয়েছে—'স্তায়ুনাং পতয়ে নমঃ' অর্থাৎ হে চৌরপতি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। প্রাচীনকালে এবং এখনও বৃহৎ ভারতের কোথাও কোথাও চুরি করার পূর্বে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য চোরের সর্দার রুদ্র বা গণেশের পুজো দেওয়া হয়। গণেশের চৌরগণেশমন্তর-এর খুব খ্যাতি আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের গণেশ গায়ত্রীতে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণেশ প্রথমে একজন 'বিঘ্নকারক' দেবতা বলে পরিচিত ছিলেন। সেই কারণে গণেশকে বিঘ্নেশ ও বিঘ্ননায়ক বলা হয়। বন্যহস্তী ও ইঁদুর চাষিদের পরম শত্রু। কারণ তারা শস্যের বহু ক্ষতি করে। সেই জন্যই গণেশের সঙ্গে ইঁদুরের সম্বন্ধ আছে।

বাঙালিদের কাছে দুর্গার আর এক পুত্রের নাম কার্তিক। গণেশের ছোট ভাই। উভয়ের জন্ম অপ্রাকৃত এবং অযোনিজ। লজ্জাকরও বটে। শাস্ত্র পণ্ডিতেরা কার্তিকের জন্মের নানা উপাখ্যান লিখেছেন। অন্যতম একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, একদা এক আনন্দঘন মুহূর্তে শিবের তেজঃ ধরিত্রীর বুকে স্খলিত হয়। ধৈর্য্যশীলা ধরিত্রী সেই ভয়ংকর তেজঃ ধারণ করতে অক্ষম। তিনি সেই স্খলিত

তেজঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেন। শঙ্করের তেজঃ শুদ্ধ হয়ে তা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে এক সরবনে গিয়ে সেই তেজঃ দেবশিশু রূপে আবির্ভূত হয়। ছয়টি কৃত্তিকার স্তনে লালিত পালিত হয়েছিলেন বলে, তাঁর নাম ষড়ানন। কৃত্তিকাদের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন, তাই তিনি কার্ত্তিকেয় বা কার্ত্তিক। যা! এও কি সম্ভব? এখন ধর্মে সবই সক্ষম। বিশ্বাস এমনই বস্তু যেখানে সত্যি মিথ্যা বলে কিছু হয় না। প্রশ্ন করা যাবে না। তোমাকে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে মানতে হবে মহাদেবের তেজঃস্কন্দ ক্ষরিত হয়ে জন্ম হয়েছিল বলে, তাঁকে বলা হয় স্কন্দ। হিমালয়ের পাদদেশে গুহাবাস হেতু তাঁর অন্য নাম গুহ। অনেকে মনে করেন কার্ত্তিক অবিবাহিত, চিরকুমার। একথা সত্য নয়। বেশিরভাব পুরাণ শাস্ত্রে কার্ত্তিক বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম দেবসেনা আর পুত্রের নাম বিশাখা। দেবসেনা বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিকট ষষ্ঠীদেবী রূপে পরিচিত। কার্ত্তিকের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত দেবতারা (আর্যদস্যুরা) তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীকে ব্যবহার করেছেন। একবার ভয়ংকর বীর যোদ্ধা তাড়কাসুরকে বধ করার জন্য দেবতারা কার্ত্তিকের জন্ম দিলেন। শুধু তাই নয়, পুরুষ প্রধান-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থায়ী সেনাপতির চাকরি কার্ত্তিকই পেলেন। পাশাপাশি শিবপুত্র কার্তিক হয়ে উঠলেন চূড়ান্ত ভোগী। কামাসক্ত। বেপরোয়া কার্ত্তিক, দেবপত্নীদের তিনি শয্যাশায়িনী করতে বাধ্য করতেন। লে হালুয়া! কার্তিকের এ কোন চরিত্র? দেব পত্নীদেরও ছাড়েন না?

ময়ূর ও মোরগ সমবর্গীয় পাখি। শ্রীশ্রীচন্ডীর প্রখ্যাত টীকাকার গোপাল ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"কুক্কুমোঽপি কার্ত্তিকেয়স্য বাহনম্" মহাভারত ও মৎস্য পুরাণেও এর প্রমাণ আছে। (এক) যুদ্ধ, (দুই) প্রাতরুত্থান, (তিন) দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী ও (চার) বিপন্ন স্ত্রীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা - মূলত এই চারটি গুণের

জন্য ময়ূরকে কার্ত্তিকের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্যে কুমার বা কার্ত্তিকের নাম পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিদেবতার বহু নামের মধ্যে কুমার নামটি দেখা যায়। প্রথমে অগ্নি, শিব ও কুমার একই দেবতা ছিলেন। এদিক থেকে কার্ত্তিকের সঙ্গে মা দুর্গার ছেলের সম্পর্ক বোঝায় না। যা বোঝায় তা হল স্বামী-স্ত্রীর। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র পড়লে সাধারণ মানুষের মাথা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেবতাদের প্রতি অন্ধ ভক্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। স্কন্দ বা কার্ত্তিক প্রথমে বিঘ্নকারক গণদেবতা ছিলেন। একথা মহাভারতের বনপর্বে স্কন্দ উপাখ্যানে পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণে কুমার বা কার্ত্তিককে "চোর ডাকাতের দেবতা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'দশকুমার চরিত', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি কাব্যেও স্কন্দ বা কার্ত্তিককে চোরের দেবতা বলা হয়।

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের সময়ে (পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রক্ষিত) একটি মুদ্রায় OESO এবং NANA নামে একটি নারী ও পুরুষ মূর্তি আছে। গবেষকগণ মনে করেন, পুরুষমূর্তিটি ভবেশ আর নারী মূর্তিটি উমাপার্বতীর। পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রাখা একটি নারী মূর্তির হাতে পদ্মফুল এবং রত্নভাণ্ড। মূর্তিটির নীচে OMMA নাম লেখা। এই নারী মূর্তিগুলি আসলে লক্ষ্মীমূর্তি।

লক্ষ্মী মূলত ধনের দেবী। তিনি সমুদ্রোদ্ভবা। হাতে তাঁর শালি ধানের মঞ্জরী ও পদ্ম এবং বুকে কৌস্তুভমণি। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, "বাণিজ্যরূপা বাণিজ্যম্", বণিকদের সম্বন্ধে তিনিই বাণিজ্যরূপিনী; তিনিই সর্বপ্রকার শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার অর্থ নিয়ে অর্থলোভীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কলহের। এ অর্থে তিনিই "পাপিনাং কলহাঙ্কুরা'। কথিত আছে, দেবী লক্ষ্মীই শাপভ্রষ্টা হয়ে পদ্মা নদীরূপে অবতীর্ণা। আমরা ধন্য অর্থাৎ বঙ্গবাসী ধন্য। কেননা, পদ্মা নদী বঙ্গদেশের মধ্যাংশ দিয়ে প্রবাহিত। গোটা বঙ্গদেশকে তিনি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা

করেছেন। প্রবহমান নদের জীবনচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষি ব্যবসায়ী 'কান্তা কাঞ্চনসন্নিভা' হয়েছেন। বঙ্গ জন সমাজের কাছে তাই দেবী লক্ষ্মী নিত্য কৃষিময়ী। পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় মুক্তা, সোনা, শঙ্খ, কড়ি, মৎস্য, উর্বর পলি মাটির দখলদারি নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধ বাধে। অর্থাৎ ভণ্ড পরগাছা দেবকুল (বর্ণবাদী) এর সঙ্গে দেশজ অসুরদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। ছল-চাতুরির মধ্যে দিয়ে দেবতারা অসুরদের হারিয়ে সব সম্পদ কেড়ে নেয়। এই সকল মূল্যবান সম্পদের মালিক অসুর বা প্রাচীন ভারতীয় বা সিন্ধবাসীদের, দেবতারা (আর্যদস্যু) সেই সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করেন। নদীমাতৃক উর্বর ভূমির বাসিন্দারা শস্যসম্পদের শক্তিরূপে দেবী লক্ষ্মীকে স্মরণ করে আসছেন। শ্রমজীবী সমাজের অর্জিত সম্পদ শ্রমবিমুখ আর্যদস্যু ও পরবর্তীকালে এদেশে মধ্যস্বত্বভোগীরা জোরপূর্বক কেড়ে নিতেন। আজও নিয়ে চলেচেন। প্রাচীন কালের বেদ-পুরাণে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। বর্তমান কালের সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতিতে চোখ রাখলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে দেবী লক্ষ্মীকে (কৃষিজীবী মানুষের নিকট শস্যফলন কেন্দ্রিক উৎসবই আর্যদের দ্বারা লক্ষ্মী দেবী রূপে পরিচিতি লাভ করে) হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষজন নিজেদের মত করে সাজিয়ে নেন। লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে পেচক বা পেচাকে জুড়ে দিয়ে আর্যদস্যুরা তাদের চরিত্র আরও ফুটিয়ে তুলেছেন। **আর্যদস্যু বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতরাও পেচার মত স্বভাব পালন করেন। দিনের আলোয় সে নিরীহ গো-বেচারা, ঘনপত্রসমাচ্ছাদিত গাছের কোটরে আত্মগোপন পরায়ণ। আর রাত্রির অন্ধকারে সে দুর্ধর্ষ হিংস্র। নিরপরাধ ঘুমন্ত পাখির বাচ্ছা, ব্যাং, ইঁদুর তার শিকারের লক্ষ্য। গরীব কৃষক মানুষের রক্তশোসক, কর্মবিমুখ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত। রক্তের বীভৎস পিপাসায় পেচা যেমন তাদের ওপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লব্ধ শিকার নখতাড়কে ছিন্নভিন্নপূর্বক নিজের**

ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে। ব্রাহ্মণ্য মানসিকতাও তদ্রুপ পৈশাচিক ও অমানবিক। পেচার পক্ষদ্বয় এমন সুকৌশলে নির্মিত যে বিদ্যুৎ বেগে উড়ে গেলেও তাতে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না। যাতে শিকার তার আগমন বার্তা জানতে না পারে। ঠিক অনুরূপভাবে ভন্ড গোঁসাই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধর্মের বা ভগবানের দোহাই দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে অনায়াসে শোষণ করে থাকে।

লক্ষ্মী হোক আর সরস্বতী হোক, পুজোর প্রাচীনত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োর প্রায় ক্ষুদ্রকায় রুগ্ন নারীমূর্তি এবং উদ্ভিদগর্ভা নারীমূর্তি মাতৃপুজোর নিদর্শন বহন করে। অথচ যাদের উদ্ভবের ইতিহাস গর্বের নয়, বরং লজ্জার, এদেশের কৃষক-শ্রমিক সমাজ সেই কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো দেবেন। বিচিত্র মানুষের মন, শিক্ষা, জ্ঞান ও বোধ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর পুজো দিতে দিতে এদেশের কৃষক-শ্রমিক সমাজ ফতুর হয়ে গেল। লক্ষ্মী না দিল অর্থ, সরস্বতী না দিল বিদ্যা। এদেশে সাধারণ মানুষের ঘরে খাদ্য-সম্পদ ও শিক্ষা-সম্মান পাওয়ার জন্য কোনও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবতার বা মহাপুরুষেরা কিছুই করেননি। এইসব কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর, জ্যোতিরাও ফুলে, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার, ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের মত মানুষজনকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। অথচ কোনও সমাজে সেভাবে এই সকল বরেণ্য মানুষেরা সামান্য সম্মানটুকুও পান না। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে ভয়ংকর প্রহসন।

বহিরাগত যাযাবর আর্যগণ নিজেদের সুরলোক বা কল্পিত দেবলোকের নাগরিক হিসাবে প্রচার করেন। তুক্-তাক্ প্রিয় আর্য ঋষিরা (ধর্মান্ধ পরজীবী পুরোহিত) পরাজিত সিন্ধুবাসীদের স্বর্গসুখের স্বপ্ন দেখান। আবার নরক যন্ত্রণার ভয়ও দেখান। কী করলে স্বর্গসুখ হবে? দেব-দ্বিজে পুজো ও দেবদেবীর নামে আর্য ঋষি (আর্য পুরোহিত)-দের অর্থ-সম্পদ-খাদ্য দান করলে। আর্য ব্রাহ্মণ পরাজিত

সিন্ধু বা হিন্দু বা পরবর্তীকালে ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যা শিক্ষা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। মেহেরগড় - হরপ্পা - মহেঞ্জোদড়ো - সিন্ধু সভ্যতার উৎপাদনশীল নাগরিকগণ হয়ে গেলেন অলস ও কর্মবিমুখ এবং যুদ্ধপ্রিয় ও কূটকৌশলী ব্রাহ্মণ্যধর্মের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দাস। সুরলোক বা দেবলোকের এই মানুষদের বলে সুর বা স্বঘোষিত দেবতা। এদের সঙ্গে যোগ দেন এদেশের ক্ষমতালোভী, ধুরন্ধরনেতা-উপনেতারা। পবন, বরুণ, ব্রহ্মা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এ সময়েও দেখা যায়, সংরক্ষণের সার্টিফিকেটের দয়ায় সরকারি কর্মচারি আর বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী এদের প্রধান কাজ হল, ব্রাহ্মণ্য প্রধান সরকারে থেকে মূলনিবাসী মানুষের জাগরণকে আটকে দেওয়া। আর মূলনিবাসী মানুষের পাশে থাকার মন ভুলানোর বাণী বলে নিজেরনাম প্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা করা। ব্যর্থ চেষ্টা বলছি এই কারণে যে, মানুষ কখনও তাদের অন্তর তেকে ক্ষমা ও সম্মান করতে পারে না। বিকৃত মনের প্রচারের আলো সর্বক্ষণের জন্য তাদের জীবনে পড়ে না। এরাবেশির ভাগ মরার আগে মরে। কেউ মরার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়।

নরবলি ছিল আর্যদের ধর্মের একটি অঙ্গ এবং সেটিকে বলা হত নরমেধ যজ্ঞ। এই সব আচার-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় যজুর্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ, সংখ্যায়ন এবং বৈতন সূত্রে। জননেন্দ্রিয়ের পুজো বা যাকে বলা হয় লিঙ্গমূর্তি পুজো, প্রাচীন আর্যদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। লিঙ্গমূর্তি পুজো পদ্ধতি স্কন্ধ বলে পরিচিত ছিল। অথর্ব বেদের ১০-৭ স্তোত্রে দেখা যায় যে, **অশ্বমেধ যজ্ঞ আর্যদের একটি বিকৃত ধর্মীয় প্রথা। অশ্বমেধের একটি বাধ্যতামূলক অঙ্গ ছিল মেধ বা মৃত অশ্বের সেপসটি (লিঙ্গ) যজমানের প্রধানা স্ত্রীর যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করানো, যার সঙ্গে থাকত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দীর্ঘস্থায়ী মন্ত্রোচ্চারণ।** বাজসনেয় সংহিতায় একটি মন্ত্র (২২.১৮) দেখায় যে, অশ্বর দ্বারা এই জঘন্য কর্মটি করানোর সম্মান পাওয়ার জন্য রানিদের

মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। যাঁরা এই সম্বন্ধে আরো বেশি জানতে চান তাঁরা যজুর্বেদের মহিধরের বিবৃতিতে তা পাবেন। সেখানে তিনি এই অশ্লীল রীতি-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

আর্যরা ছিল একটি জুয়াড়ি জাতি। আর্যসভ্যতার প্রথম দিকে জুয়াকে তারা সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। তারা বাজি ছাড়া খেলত না। রাজ্য এমনকি স্ত্রীদের পর্যন্ত বাজি রাখা হত জুয়া খেলায়। রাজা নল তাঁর রাজ্য বাজি রেখে জুয়া খেলেছিলেন এবং তাতে তিনি রাজ্য হারান। পাণ্ডবরা আরও বেশি এগিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু রাজত্বই বাজি রাখেননি, তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদীকেও বাজি রেখেছিলেন এবং দুটোই তাঁরা হারান। আর্য দেবতাদের সাম্রাজ্য ও ঘরের কুলবধূকে বাজি ধরায় অধর্ম হয় না। বাজিতে জিতে নারীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে অধর্ম হয়। এই হল, আর্য শিক্ষা। অথচ দেশজ মূলনিসীদের কাছে এ দুটো কাজই খারাপ কাজ। অধর্ম।

বিদেশী আর্যদের সঙ্গে যেহেতু কোনও নারী ছিল না, তাই তারা পিতৃতান্ত্রিক ছিল। এদেশের নারীদের জোরপূর্বক বলাৎকার করত, **সন্তানধারণ করতে বাধ্য করত। আর্য বা দেবতা বা সুরদের ধর্ম হল ছলে-বলে-কৌশলে পরের ধন-দৌলত-খাদ্য-সম্পদ লুণ্ঠন করা, শত্রুকে নিধন করা। বেদ-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত সর্বত্র দেবতাদের হীন ও অমানবিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়।**

ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন কাহিনি, উপ-কাহিনিতে মহিষাসুর বধের মূল জীবন-সংগ্রাম আলোচনার পূর্বে দেখে নেব বঙ্গদেশে দেবী দুর্গার পুজো চালু হল কোন প্রেক্ষাপটে। বঙ্গদেশে কবে দুর্গাপুজো প্রথম প্রচলিত হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে একথা নিশ্চিত, ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলা দুর্গাপুজোর

প্রচলন হয়নি। ইসলাম ধর্ম প্রসারের পূর্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের পর্যায়ক্রমে বিকাশ ঘটে। ইসলাম ধর্মের বিকাশের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মকে পিছনে ফেলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এলেও অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দশতম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ছিল বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির কাল। সপ্তম শতকে (৬২৯-৬৪৫ সালে) চীন দেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর এদেশে আসার পূর্বেই বঙ্গদেশে বসবাসকারী পৌন্ড্র, কিরাত, কৈবর্ত, বঙ্গ ও বাগদিদের একটা অংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। বঙ্গের নমরা মানবিক কর্মপরায়ণ একটি জাতি ছিল। তথাকথিত ধর্মের ভণ্ডামীতে তাদের বিশ্বাস ছিল না। দেব-দেবী বা শয়তানে তাদের বিশ্বাস ছিল না। তাই ধর্ম ব্যবসায়ীরা নমদের 'চণ্ডাল-চাড়াল' বলে দাগিয়ে দিত। গালি দিত। যেহেতু নমরা বীরের জাতি ছিল তাই ভয়ে দেবতারাও এই ভূমিতে এসে নষ্টামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারতো না। যাইহোক, পালরাজা ধর্মপালের আমলে বর্তমানের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরে সোমপুর জৈন বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরেই বৌদ্ধ মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ৭৫০ থেকে ১১৬০ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চক্রান্তে বৌদ্ধধর্ম তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধনার কেন্দ্রভূমি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা পরবতীকালে নেপাল, ভূটান ও তিব্বতে বিস্তার লাভ করে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব" গ্রন্থে পাল রাজাদের সম্পর্কে লিখেছেন—"ইহারা মহাযানী বৌদ্ধ সংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মও ইহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। ... একাধিক পালরাজা পুরোহিত সিঞ্চিত শান্তিবারি নিজেদের মস্তকে ধারণ করিয়াছেন"। শুধু তাই নয়, পাল যুগে ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হতেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য

দেবদেবীদের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। তারা, ভীমা, অপরাজিতা, কুপালিনী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধ সাধনমালায় দেখা যায়। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য" বইতে বৌদ্ধতন্ত্রে কালী সম্পর্কে লিখেছেন, "ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভূজা, অগ্নিকোনস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শিবের উপর অবস্থিতা"। বৌদ্ধ এই কালীর রূপ প্রায় বর্তমান ব্রাহ্মণ্য কালীরই প্রতিচ্ছবি। তবে একথা সঠিক যে, বৌদ্ধতন্ত্রগুলি লিখিত হওয়ার অনেক পরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রগুলি রচিত হয়। আবার গুপ্তযুগের রাজা-মহারাজারা 'পরমভাগবত' শব্দটি নামের আগে যোগ করে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কারণ গুপ্ত রাজারা 'বৈষ্ণব ভাগবত' ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। বাংলার বর্মণ, দেববংশ ও সেন বংশীয় রাজাগণ (১১৫৯-১২০৬ সাল) বৈষ্ণব ছিলেন। লক্ষণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করে বৈষ্ণব ধর্মকে আরও শক্তিশালী করেন। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম এই তিন ধারার সমন্বয় বাংলাকে মিশ্র ধর্মাবলম্বী করে গড়ে তোলে। এই ধর্মীয় ত্রিধারা থেকে অনেকটা প্রভাবমুক্ত ছিলেন বাংলার কৃষিজীবী সমাজের মানুষ। বিশেষ করে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী নমরা। যার ফলে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের ধর্মীয় আত্মসমর্পণের পরাজয় ঢাকার জন্য, এদের অবজ্ঞা করার কৌশল নিলেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলার কোথাও দুর্গাপুজোর উল্লেখ মেলে না। **সেন-বর্মণ যুগে শুধুমাত্র তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রাজকার্যে প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্তিবারিক তন্ত্রসাধক, তন্ত্রধারক প্রভৃতিরাই মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজকর্মচারী রূপে নিযুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্র একটি উগ্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে পরিণত হয়। সেন-বর্মণ আমলের পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট ও ব্রাহ্মণকূল তিলক হলায়ুধ মিশ্র "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" ও "পণ্ডিত সর্বস্ব" রচনা করেন। সে সময়ের উচ্চতর আদর্শ**

একমাত্র জ্যোতিষ চর্চা। ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ মিশ্র, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিয়মিত জ্যোতিষ চর্চা করতেন। ফলে গোটা ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্মবিমুখ অথচ ভোগ বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েন। শৃঙ্গার রসের আকর গ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দ এ সময়ে রচনা করা হয়। আর সেই সঙ্গে বৌদ্ধ সহজযানীদের প্রভাবে রাজপ্রাসাদ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই যৌনাতিশয্যের প্রাবল্য দেখা যায়। এভাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণামে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন, 'জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের পানীয় গ্রহণ বা দ্রব্য ভোজন, এমনকি নিষিদ্ধ ভোগ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দু জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমানে কোনও হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়াই গণ্য হইত। সেই সমুদয় হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না'। কি ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম। ধর্মীয় সাধারণ মানুষের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। আবার একথা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই যে, হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা অন্যান্য ধর্ম ভালো। মোটে তা নয়। সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আচার বিচারের নামে চলে মানসিক শোষণ। গোটা মুসলমান শাসনে একমাত্র তথাকথিত হিন্দুরাজা গণেশ পরধর্ম বিদ্বেষ ও স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যের কারণে বর্তমানে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাস ওঝাকে দিয়ে একটি বাংলা রামায়ণ রচনা করান। যেখানে রাম কর্তৃক দুর্গাপুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুক ভট্ট প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী জেলার রায় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) সর্বপ্রথম মাটির প্রতিমা গড়ে দুর্গাপুজো প্রবর্তন করেন।

নিজের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও জমিদারির বিস্তার লাভের জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজসিকভাবে এই শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত" পুস্তকে লিখেছেন, "কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজশাহী জেলার ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। দুর্গা পূজায় ধর্মের কোন লেশগন্ধ নেই। আছে ব্যক্তি প্রচার। সংগঠনের প্রচার মহাত্মাকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষ নির্যাতন।

বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাস খুব পুরনো নয়। রাজা শশাঙ্কর আমলে বাংলার ধর্মমত ছিল শৈব। তখনও দুর্গার পুজো হত না। রাজা গোপালের পর থেকে গোটা পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের যুগে দুর্গা কেন, কোনও মূর্তিপুজোরই চল ছিল না, বললে চলে। তা সত্ত্বেও সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, মনসা-র মত তথাকথিত অ-কুলীন বা গ্রামীণ দেবীরা সাধারণ মানুষের পুজো পেয়েছেন, মূর্তি ছাড়াই। কলকাতার পুজোর ইতিহাসেও দেখা যায় জগৎ শেঠ-উমি চাঁদ-ঘসেটি বেগম - মিরজাফরদের সহযোগিতায় ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাস্ত করায় ইংরেজদের 'মুন্সি' রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রথম জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজো করেন। **এই রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুজোয় ইংরেজরা জুতো পরেই পুজো মণ্ডপে পবেশ করতেন। এই পুজো উপলক্ষে মদ ও বাঈজিদের আসর বসত, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কামান দাগা হত, ভাসানে আর্মি ব্যান্ড আসতো। প্রথম দিক থেকেই দেশ প্রেমিক বিপ্লবীরা এই দুর্গাপুজোকে 'বেইমানের পুজো' আখ্যা দিয়েছিলেন। তারপর বেলেল্লাপনার পাল্লা দিতে দিতে আজ দুর্গা পুজোর এই বাড়-বাড়ন্ত। দুর্গা পুজোয় যদি বৃটিশ দালালদের এত উন্নতি হয়, তবে তার আরাধনায় পুজোকর্মী ও পুজো আয়োজকদের নিশ্চয় উন্নতি হবে; এই বিশ্বাসে পুজো সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেকালের বিত্তশালীদের**

বড়লোকি দেখাবার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় ছিল দুর্গোৎসব। কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর গন্ধবণিক শিবকৃষ্ণ দাঁ তাঁর প্রতিমার জন্য প্যারিস থেকে গয়না বানিয়ে এনেছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পুজোয় ব্যবহৃত সোনার অলংকার বিসর্জনের সময় গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। হুগলির জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার সেকালে সোনার প্রতিমা গড়ে পুজো দিতেন। শুধু তাই নয়, চার ফুটের সোনার প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিকের 'মানদন্ড' দেখা দিল 'রাজদন্ড' রূপে। পরিণতিতে তৈরি হয় হঠাৎ ধনী হওয়া এক ধরনের বাবু শ্রেণি। ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে ওই সব বিত্তবান ধনী শ্রেণির অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছিল। সদ্য গজিয়ে ওঠা বিত্তশালী ও উচ্চাকাঙ্খী বর্ণবাদীদের আদর্শহীনতা, চারিত্রিক শৈথিল্য, প্রকট পরধর্ম বিদ্বেষ এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের মুসলমান বিরোধী দ্বি-জাতি তত্ত্বের পটভূমিতেই সপ্তদশ শতক থেকে দুর্গাপুজো ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। কলকাতায় ১৬১০ সালে প্রথম দুর্গাপুজো করেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, পাঠান রাজত্বের অবসান আর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সন্ধিকাল থেকে বাংলায় বারো ভুঁইয়াদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে থাকে। এক সময় বাংলার বেশিরভাগ বারো ভুঁইয়ারা মোগল সম্রাটদের রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। সে সময় বাংলার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ে মোগলদের রাজস্ব দফতরের কানুনগো ছিলেন বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য তাঁর প্রিয় বন্ধু ও হিতাকাঙ্খি লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরীর সহযোগিতায় বাংলার বারো ভুঁইয়াদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন মোগল সম্রাট আকবরকে সমস্ত কর মিটিয়ে দেন। সম্রাট আকবর খুশি হয়ে প্রতাপাদিত্যকে মহারাজা উপাধি দেন। এরপরই মহারাজা প্রতাপাদিত্যর ক্ষমতালিপ্সা বাড়তে থাকে।

এক সময় মহারাজা প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাটের বশ্যতা অস্বীকার করে যশোহর অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি পর্তুগীজ যুদ্ধবিদ রড্ডার রণকৌশলের সাহায্য নিয়ে মোগল সম্রাটের প্রশাসক, সোনাপতিদের একের পর এক পরাজিত করতে থাকেন। সব চাইতে তিনি যে জঘন্য সে কাজটি করেন তা হল, পিতৃবন্ধু সুন্দরবন অঞ্চলের জায়গিরদার বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউ ঠাকুরানির হাট' উপন্যাসটি এই ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি সে সময়ে তাঁর (প্রতাপাদিত্য) সম্বন্ধে যা-কিছু তথ সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লিশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ক্ষমতা ছিল না। অচিরেই প্রতাপাদিত্য ও লক্ষ্মীকান্ত দুই বন্ধুর মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বাংলার গভর্নর মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে বারবার ব্যর্থ হন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "... অতঃপর লক্ষ্মীকান্তের বাবা কামদেব ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদ ও পরামর্শ নিয়ে মোগল সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দি করেন। সন্তুষ্ট হয়ে মানসিংহ ১৬০৮ সালে মোগল সম্রাটের সম্মতিতে কলকাতা সহ বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের জায়গির দেন লক্ষ্মীকান্তকে। এই লক্ষ্মীকান্তের পরিবারেরই উত্তরপুরুষের উপস্থিতিতে ১৬৯৮ সালের ১০ জুন বড়িষার কাছারি বাড়িতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা তিনটি গ্রাম ১৩০০ টাকা খাজনা জমার বিনিময়ে চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

আজকের কলকাতার নগরীর পত্তনের সূচনা হয় জোব চার্ণকের জামাতা চার্লস আয়ারের মধ্যস্থতায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা সেই চুক্তিপত্রের নকল রয়েছে। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের মিউজিয়ামে ১৬০৮ সালে

জাহাঙ্গীরের দেওয়া, রায় বাহাদুর উপাধির পরিবর্তে রায়চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময় প্রচলিত কুলীন ব্রাহ্মণদের সমর্থিত বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় কুলীন সমাজাধিপতি দেবীবরের সঙ্গে বিরোধ ঘটে লক্ষ্মীকান্তের। আর মূলত এই কারণে কুলীন সমাজচ্যুত করা হয় লক্ষ্মীকান্তকে। আর এই পরিস্থিতিতে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে জনসমর্থন পেতে লক্ষ্মীকান্ত ১৬১০ সালে বড়িষার বাড়িতে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠা করেন। শুধুমাত্র নিজের প্রতিপত্তি আর বংশ গৌরব ধরে রাখার জন্য দুর্গা পুজোর প্রচলন। তবে তাঁরও পূর্বে ১৬০৬ সালে নদীয়ার মহারাজা ভবানন্দ মজুমদারও দুর্গাপুজো করেছিলেন। তবে অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দে হঠাৎ ধনী হওয়া চরম বিলাসী নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭০১-১৭৮২), শোভাবাজারের তালুকদার রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপুজো ছিল চোখে পড়ার মত। বিমলচন্দ্র ঘোষের "দুর্গাপুজো : সেকাল থেকে একাল" গ্রন্থে লিখেছেন, 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথম দুর্গাপুজো উপলক্ষে নাচ দেখানোর (বাইজি নাচ) ব্যবস্থাও করেছিলেন। নবকৃষ্ণ দেবও কম যান না। যত দিন গেছে বাইজি নাচের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজের জয়ে উল্লসিত হয়ে বিজয় উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসব করেছিলেন। সেখানে ১০০১টি পশুবলি হয়। বিভিন্ন দেশের নাচ ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। এই দুর্গোৎসবে লর্ড ক্লাইভ নানারকম উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ধনী পরিবারে দুর্গাপুজোর উৎসব প্রাঙ্গন ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে এদেশের বাবু সম্প্রদায়ের অন্যতম মিলনস্থল। আন্দুলের রাজা রামচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ভূস্বামী গোবিন্দ রাম মিত্র, জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ প্রমুখ ধনী পরিবারের দুর্গোৎসবে বাইজি নাচ ও বেশ্যা সমাগমে ভরে থাকত। বিসর্জন উপলক্ষে চলত নানারকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, গালিগালাজ

ও বেশ্যাগমন। মহারাজ সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গাপুজো সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের Calcutta Chronicle-এ প্রকাশিত বক্তব্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের কলমে—The only novelty that rendered the entertainment different from last year was the indroduction or rather the attempt to introduce some English tunes among the Hindoostanee music.

সেকালের দুর্গাপুজোয় সকলের জন্য আমন্ত্রণ থাকলেও গরীব দুঃখী অসহায় মানুষজনের পুজোবাড়িতে প্রবেশের অনুমতি মিলত না। দু-এক জন প্রবেশ করলে তাদের অভ্যর্থনার বদলে জুটতো জুতো পেটা, গালি ও নানারকমভাবে অপমান। এমনকি কুমোর, ঢুলি, মালাকার ও অন্যান্য কারিগর যাদের পরিশ্রম ব্যতীত দুর্গাপুজো সম্ভব হত না, তারাও সম্মান পেতেন না। রাজা মহারাজা ও ধনী শ্রেণির পর দুর্গাপুজো ক্রমশ বারোয়ারী দুর্গাপুজোর রূপ নেয়। এক বারোয়ারি দুর্গাপুজো সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, "চুরোট, তামাক ও চরসের ধুয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠল যে, আধঘণ্টা প্রতিমাখানি দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, '... সেই সঙ্গে কাঙ্গালী, ভাট ও ফকির জাতীয় মানুষও সেখানে ভীড় করতেন। কিন্তু পাহারাওয়ালারাই তাদের বিদায় দিতেন। অনেক গরীব মানুষ গ্রেপ্তার হত।' আবার কোথাও কোথাও 'কাঙ্গালী ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা থেকে মশাগুলো পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে।' বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সাথে যে সামাজিক গ্লানি জড়িত হয়ে পড়ে তা ১৮৮৭ সালের সোমপ্রকাশ পত্রিকা লক্ষ করলেই প্রকট হয়ে ওঠে—'আজকাল বারোয়ারিতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করা যায় না। প্রায় মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারোয়ারির পান্ডাদিগের আমোদ-প্রমোদ হয়। ... বারোয়ারি পান্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরগ্লানি করিয়া দিনাতিপাত করে। ... চৌর্যবৃত্তিতে তাহারা অভ্যস্ত দেশে গ্রামে প্রায়ই

যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার লোকেই বারোয়ারির গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পান্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে। ... বারোয়ারি নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু ... বারোয়ারি বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়। ... বারোয়ারিতে লোকেরা হলাহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা যায়...মদ ও বেশ্যার কান্ডটা শহরেই কিছু বাড়াবাড়ি।' ষোড়শ শতকের জীমূতবাহন তাঁর 'কাল-বিবেক' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিসর্জনের সময় নানারকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, নৃত্যগীত ও মদ্য পান না করলে ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দেবেন।

উনিশ শতকে রাজা মহারাজা ধনী শ্রেণির দুর্গোৎসব ও বারোয়ারি দুর্গোৎসবের পাশাপাশি পারিবারিক দুর্গাপুজোর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮২৬ সালের ১২ অক্টোবর তারিখে Government Gazette পত্রিকায় প্রকাশ — 'বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়িতে অনেক উচ্চ-পদস্থ সাহেব মেমের সমাগমে ভোজ ও মদ্যপান হইয়াছিল। মুসলমান বাঈজি ছাড়াও ব্রহ্মদেশীয় কয়েকটি নর্তকী ও গায়িকার আমদানি করা হইয়াছিল।' ১৮২৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার Government Gazette পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিলেন — 'যাঁরা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন এবং যাঁরা পাননি সকলেই যেন তার বাড়িতে ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দুর্গাপুজো উপলক্ষে বিশাল নৃত্যোৎসবে (Grand Nauch)-ও যোগদান করেন।' এই বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সুরাপানের উত্তম ব্যবস্থা থাকবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সে সময়ের পারিবারিক দুর্গোৎসব প্রধানত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিত্তবান বাবুদের ধন-ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এবং মদ ও নারীসঙ্গ সমেত এক বিরাট বেলেল্লাপনা জড়িত বিনোদনের মাধ্যম।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভোগবাদী কর্মবিমুখ মানুষেরা চরম অসভ্যতা ও নোংরামির মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজো প্রচলন করেন। যে ধারা পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষও বহন করে চলে। বাংলার সঙ্গে দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্ব নিয়ে আদর্শ নিয়ে বিনোদন নিয়ে কোনওকালে কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেই দুর্গাপুজো হল গোটা বাঙালির প্রায় জাতীয় উৎসব। এ উৎসব হাস্যকর ও লজ্জাকরও বটে। এ মানব সভ্যতার আর এক প্রহসন। যখন দেখা যায়, সমাজে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলে দাবিদার ব্যক্তিবর্গ নতুন পোষাক পরে সপরিবারে মাটির প্রলেপের গড়া মূর্তির পিছনে বাঁশ ঢুকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে তার সামনে করজোড়ে 'রূপ দাও, যশ দাও, বিদ্যা দাও...' বলে প্রার্থনা করেন। একদিকে হাজার হাজার গরিব সাধারণ মানুষের অনাহারে মৃত্যুবরণ, অন্যদিকে তেমনি ধনী সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত সমাজের মানুষেরা দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বেলেল্লাপনায় মেতে ওঠে। ১৮৮০ সাল থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে মিশনারিরা এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। শেষমেশ ১৮৮০ সালে এই দুর্গোৎসবে ইংরেজ কর্মচারীদের যোগদান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় দুর্গোৎসব সম্বন্ধে নিন্দাসূচক একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয়—'... দুর্গোৎসবের সময় আমোদ-প্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়। ... ঈশ্বর উপাসনার ভাব কিছুই নাই...দুর্গোৎসবের উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎবের সময় অমঙ্গল দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময় বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ... পুজোর তিনদিন পাপের স্রোত বহিতে থাকে।' দুই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন যে এহেন দুর্গাকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন তা একমাত্র তাঁরাই জানেন। এদের মত মানুষের মর্মান্তিক প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ নেতাজী সুভাষ ও বাঙালি বিপ্লবীদের এত দুর্গা আরাধনা। এই

জাতীয় মানুষের প্রচেষ্টার ফলে, শারদোৎসব ঘিরে বাঙালির উন্মাদনার শেষ নেই।

দেবী দুর্গার অসুর সম্রাট মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করার দৃশ্য বা দুর্গাপুজো ঘিরে আপামর বাঙালি আনন্দ উৎসবে যখন মাতোয়ারা ঠিক তখনই বিষাদে ছেয়ে যায়, ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড়-বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুগ্রাম। বহু মানুষের মন জগত। ওই সব গ্রামে আলোর রোশনাই নেই। নেই নতুন জামা-কাপড় পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখার ঢল। পুজো-পার্বনের এই কটা দিন এইসব গ্রামের মানুষগুলো নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন অন্ধকারের আড়ালে। ঘরে ঘরে জ্বলে না সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাজে না মঙ্গল শঙ্খ। গোটা দেবীপক্ষ জুড়েই চলে এদের শোকপালন। কারণ ওঁরা যে অসুর। প্রাচীন কালের অ্যাসিরিও সভ্যতার ধারক-বাহক। এদের জীবনে সভ্যতার আলো প্রদানকারীর সম্মান মেলেনি। বরং তার বদলে ঘৃণা ও লজ্জা জুটেছে। ষোড়শ শতাব্দীর পর ঝাড়খণ্ডি নামে পরিচিত যে সুবিশাল ভূমিখণ্ডের কথা জানি, তা আজকের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার ও বীরভূম এবং ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জোর, সুন্দরগড়, বোনাই, বামরা এবং আজকের ঝাড়খণ্ড প্রদেশ। একসময় শবরভূমি নামে পরিচিত এই অঞ্চল ছিল মূলত কোল জাতিসত্তার মানুষের বাসভূমি। বিচরণ ভূমি বলাই সঠিক। কেননা, এইসব অঞ্চলের মানুষেরা প্রকৃতিপ্রিয় রোমান্টিক জীবনযাপন করতেন। প্রকৃতির ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশুশিকারই ছিল তাদের প্রধান পেশা। বেদ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তাদের জীবনে কখনও পড়েনি। আজও বহুল প্রচারিত একটি প্রবাদ শোনা যায়—'কোল-কুড়মি-কোড়া, বেদ-পুরাণ ছাড়া অর্থাৎ এইসকল অঞ্চলের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বেদিয়া, ভূমিজ, কোল-কুড়মি, কোড়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্রাহ্মণ্য বেদ-পুরাণ দ্বারা নির্ধারিত জীবনযাত্রা আজও অনুসরণ করেন না।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা মহকুমা থেকে উত্তর দিকে বেশ কিছু কিলোমিটার ভেতরে শুকানুকুটি প্রত্যন্ত একটি আদিবাসী গ্রাম। ২২টি পরিবার বাস করে গ্রামটিতে। জনসংখ্যা ১৫৫ জন। বসবাসকারী সকলেরই পদবি 'অসুর'। আশপাশ অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রামটি অসুরগ্রাম নামে পরিচিত। তাঁরা বিশ্বাস করেন তাদেরই পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য শক্তি নারী দুর্গাকে কাজে লাগিয়ে হত্যা করেছিলেন। পারসিক কন্যা দুর্গা। তাই দুর্গাপুজোয় তাঁরা অংশগ্রহণ করেন না। এমন কি দেবী দুর্গার মুখও তাঁরা দেখেন না। পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িত অনেক মানুষই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন কালো কাপড়ের টুকরো বুকে লাগিয়ে শোক প্রকাশ করেন।

শুকানুকুটি গ্রামের মানুষেরা পৌরাণিক ঘটনা ভুলে যদিও বা শারদোৎসবে মেতে উঠতে চায়, সভ্য সমাজ সেখানে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ ওদের অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছে। ভোটদানে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও অধিকার নেই শিক্ষার, অধিকার নেই কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের শরিক হওয়ার। মহিষাসুর বংশোদ্ভুত বলে পরিচিত এই আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়কে আজও ব্রাত্যই করে রেখেছে এ যুগের শিক্ষিত সভ্য মানুষেরা।

বেনু অসুর, মোটা অসুর, বুলা অসুর, মালু অসুর শুধু নয় গোটা সুকানুকুটি গ্রামের সহজ সরল এই সব মানুষদের কাছে শারদোৎসব খুব কষ্টদায়ক। মহালয়া থেকেই ওদের শোকপালন। পুজোর সময় যখন ঢাকের আওয়াজে চারিদিক মুখরিত, তখন এই অসুর সম্প্রদায়ের বাড়ির বারান্দা থেকে গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়ায় করুণ কান্নার শব্দ। **দেবী দুর্গা যখন অসুরকে হত্যা করেন, সেই অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মত শুকানুকুটি গ্রামের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুক চাপড়ে কাঁদেন। এই কান্না কাউকে**

শোনানোর জন্য নয়। কারও সহানুভূতি পাওয়ার জন্যও নয়। এ কান্না স্বজন হারানোর যন্ত্রণা। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক এ কান্নার অর্থ সমাজের লাঞ্ছনার, গঞ্জনার জন্য দীর্ঘকাল মনের কোণে জমে ঝাকা বেদনার বহিঃপ্রকাশ।

ভারত যখন মুসলমান শাসক দ্বারা শাসিত, তার পূর্ব পর্যন্ত কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এইসব মানুষেরা প্রতিরোধ গড়ে নিজস্ব জাতি সত্তা অনেকটাই ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ইসলাম শাসনের সময়ে নানা কারণে দলে দলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বহুমানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম সেখানে তথাকথিত সংখ্যালঘু এবং যেখানে ইসলাম দ্বারা শাসিত নয়; সেখানে ইসলাম শান্তির ধর্ম। আর যেখানে সে সংখ্যাগুরু এবং ইসলাম দ্বারা শাসিত সেখানে তার বিষাক্ত দাঁত-নখের অমানবিক ব্যবহারে রক্তারক্তি। গোটা বিশ্বের মুসলিম শাসিত দেশগুলির প্রতি চোখ রাখলেই এ সত্য বুজতে অসুবিধা হবে না। যাইহোক, এই সময় বৈষ্ণববাদীদের প্রভাবে সমগ্র কোল এবং খেরোয়াল জাতিসত্তার মানুষেরা হিন্দু স্তরভেদের জালে জড়িয়ে পড়লেন। জন্ম নিল পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা। গোণ্ড, গৌর, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, ভুঁইয়া, ভূমিজ, হো শবর, সাঁওতাল, অসুর, কুড়মি, বেদিয়া, কামার, কুম্ভার যাদুপেটিয়া, রাজোয়ার, লোধা, চিকবড়াইক, তাঁতি ইত্যাদি তার উদাহরণ। ফলে জঙ্গলকেন্দ্রিক যৌথ জীবন ভাবনার, যৌথ সংস্কৃতির প্রতীক কোল গোষ্ঠীর মানুষেরা টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন। কোল শব্দের অর্থেরও বদল ঘটেছে। সুবিখ্যাত নৃতত্ব বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায় তাঁর মুন্ডাজ অ্যাণ্ড দেয়ার কান্ট্রি গ্রন্থে কোল শব্দের অর্থ বলেছেন—'শুয়োরের মত দেখতে কালো শুয়োর খাদক'। এমন নামকরণ নিশ্চয়ই এই জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় নয়। এঁদের যাঁরা হেয় করতে চান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সেই মানুষরাই নিশ্চয় এই নামকরণের মূলে! বাবু-ব্রাহ্মণ-বর্ণবাদীদের দেওয়া গালি বাচক নামকরণ নিয়ে মূলনিবাসী মানুষদের বেঁচে

থাকতে হয়। বর্ণবাদীদের এই চালাকি থেকে মুক্তি লাভই মানবিক মানুষের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া দরকার।

প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষই যুগ যুগ ধরে অমানবিক লাঞ্ছনা বঞ্চনা নিয়ে বেঁচে আছেন। অথচ গোটা মানব জাতি এঁদের সাম্য-মৈত্রী ভাবনা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন কাহিনি উপ-কাহিনিতে মহিষাসুর বধের মূল বয়ান এরূপ : রম্ভ আর কারম্ভ কোল জাতির দুই বীর যোদ্ধা। এঁরা বীর, মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা ছিলেন। কারম্ভ জলযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। আর রম্ভ জল-স্থল ও শূন্যে সমান যোদ্ধা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র (ইন্দ্র হল উপাধি। দেব-ব্রাহ্মণদের দলপতি।) কুমীরের রূপ ধারণ করে কৌশলে কারম্ভকে হত্যা করেন। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রম্ভ আর্যদস্যুদের দখলে থাকা ভূ-খণ্ড থেকে তাড়ানোর জন্য আক্রমণ করেন।। আর্য দস্যুরা জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারত ভূ-খণ্ডে এসে আর্য—ব্রাহ্মণ বা দেবতা বলে নিজেদের প্রচার দেন। যেমন—মুঘলরা ভারতবর্ষ দখল করে বলল, আমরা সকলে মুঘল-মুসলমান। এদেশের বাকি সকলে হিন্দু। ঠিক একই রকম ভাবে ইউরেশিয়ানরা তথাকথিত ভারতবর্ষ দখল করে বলে, আমরা আর্য ব্রাহ্মণ, দেবতা। এদেশীয় অন্য সকলে শূদ্র, দাস, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদি। রাজ্য আক্রমণ করেন। দেবতারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। শেষমেশ আশ্রম কর্তা ব্রহ্মার প্রচেষ্টায় রম্ভ ও দেবরাজ ইন্দ্র সন্ধি করেন। ইন্দ্রের সন্ধি করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কারণ মহারাজ রম্ভর কাছে দেবরাজ ইন্দ্র বার বার হেরেছেন—

"তত্রসুরৈর্মহাবীর্যৈদেবসৈন্যং পরাজিতমর্দেতম।
জিত্বা চ সকলান দেবানিদ্রোহভমহিসাসুরঃ।"

তবু সুযোগ পেলে আর্যদস্যুরা বারবার রম্ভর রাজ্য আক্রমণ করতেন। এই মহারাজ রম্ভ ও রানি তেজার পুত্র মহিষাসুর। ঋষি শব্দের প্রাচীন অর্থ হল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তবে তা ব্রাহ্মণ্যবর্গের মধ্যে থেকে হতে হবে। দেশজ মূলনিবাসী শ্রমজীবী সমাজ থেকে ঋষি হলে হবে না। মুনি হল প্রবাহমান সমাজ থেকে বাস্তব ধর্মী জ্ঞানী ব্যক্তি। যারা মূলতঃ মূলনিবাসী। মহিষাসুর হল শ্রমজীবী সমাজের প্রতিনিধি। যার জ্ঞান ঋষি সুলভ। তাই দেব শত্রু। মহিষাসুরের যখন আট-দশ বছর বয়স, তখন তার পিতৃরাজ্য সুর বা স্বঘোষিত দেবসেনারা অতর্কিত আক্রমণ করেন। যুদ্ধে একে একে মহারাজ রম্ভ সহ রাজ পরিবারের প্রায় সকলেই মারা যান। যে কয়জন বেঁচে ছিলেন, তাঁরা রম্ভর বালক পুত্রকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান।

জঙ্গলে বাড়তে থাকা বালকের প্রধান বাহন ছিল মহিষ। মহিষ জঙ্গলবাসী মানুষজনের কাছে দেবতাও বিশেষ। মহিষ জঙ্গলের অন্যতম শক্তিশালী জীবও বটে। **ব্রাহ্মণ্য স্বার্থবাহী ধর্মশাস্ত্রকার মহিষাসুরের জীবন সংগ্রামের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। অসুর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল দেবশত্রু মহাবল জাতি বিশেষ। বেদের প্রাচীনতর অংশ পারসিক আবেস্তায় অসুর-অহুর-দেবতা। যারা মূলত নগর সভ্যতার সাম্যবাদী নাগরিক। এদেশ আক্রমণের পর থেকে যাযাবর আর্যরা এদেশীয় লোভী বিভীষণদের সঙ্গে নিয়ে দেবতা শব্দটি দখল করে এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তুক্-তাক্ ও নানারকম কুসংস্কার প্রয়োগ করে নিজেরা দেবতা সেজে বসে।** যুগ যুগ ধরে অলীক কল্পকাহিনি জনমানসে প্রচার করেন। যদিও কাহিনিগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস্তব সত্য লুকিয়ে থাকে। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার জন্য মহিষাসুর জঙ্গলেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হন। ক্রমশ শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে, একে একে তাঁর সমস্ত হারানো পিতৃরাজ্য জয় করেন। এমনকি, আর্য বা দেবতাদের স্বর্গরাজ্যও দখল করে। স্বর্গরাজ্য বলতে পাহাড় ও পাহাড় দেখা। আর্য অধিকৃত অঞ্চল। মূলত জম্মু-

কাশ্মীর সহ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। একটা সময়ে সরস্বতী নদীর অববাহিকাও দেবতা বা আর্যদের দখলে ছিল। মহিষাসুরের কাছে হেরে গিয়ে আর্য বা দেবতারা প্রাণভয়ে পালিয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে সরে যেতে থাকে। পথে ক্লান্ত দেবতারা বর্তমান ইরান ইরাক অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তখনকার দিনে মধ্য ও উত্তর এশিয়ার বেশিরভাগ জায়গা ছিল, যাযাবর জাতির বিচরণ ক্ষেত্র। পরবর্তী সময়ে এই সকল স্থান আশ্রমভিত্তিক রূপ নেয়। দেবসেনাদের অসহায় অবস্থা দেখে সেখানকার আশ্রম অধিকর্তা তাঁদের এই বলে আশ্বাস দান করেন যে, ভারতীয় ভৌগলিক অবস্থানে বসবাসকারী ভারতীয়গণ শত্রুবিহীন অবস্থায় অলস ও আমোদ-প্রমোদ বিলাসী হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ নামকরণ ও ভরত নামক একটি শক্তিশালী জন সমাজের নাম থেকে এসেছে। যাযাবর বর্ণবাদী ও রাজ্য দখলদারীদের অত্যাচারে নানান সমাজের সাথে মিশে গেছে। দেশের কথাও তাদের আলাদা অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। যেমন—অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের নানান অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুন্ডা-সাঁওতাল প্রভৃতি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে। নমরা বেশ খানিকটা ধরে রাখতে পারলেও বঙ্গের নানান জাতিতে মিশে গেছেন। নতুন সমাজ তৈরি করে নিয়েছে। যাইহোক, মহিষাসুর এখন শত্রু বিহীন। সুতরাং সে এখন অলস ও বিলাসপ্রিয়।

একথা প্রায় সকলের জানা যে, শস্য শ্যামল নদী মাতৃক বাংলার গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ তিন মাস কাজ করেন, আর ন'মাস উৎসব, মেলা ও পুজো পার্বনে কাটিয়ে দেয়। এই চিত্র শুধু বঙ্গদেশে নয়, গোটা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বা মধ্য ভারতের সর্বত্রই একই দৃশ্য। বিশেষ করে নদ-নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চলে, যেখানে শস্য উৎপাদন হয়। ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ করে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম আরব সাগর, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ভারবর্ষকে বারবার রক্ষা করছে। ফলে ইউরোপের মত বিরামহীন

যুদ্ধ, গণহত্যা, লুণ্ঠন, এদেশের সহজ সরল মানুষদের স্পর্শ করতে পারেনি। তার ওপর ঋতু বৈচিত্র্য, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, চাহিদার চাইতে খাদ্যের যোগান বেশি থাকায় এখানকার প্রাচীন অসুর সভ্যতার মানুষ যেমন আরামপ্রিয় তেমনি সাম্যবাদী এবং মানবিক। এই সুযোগটা নেয় বিভিন্ন সময়ে আগত যাযাবর জাতিগুলি। যাদের মধ্যে অন্যতম হল নর্ডিক বা আর্যভাষীরা। এদেশের সু-উন্নত নগর সভ্যতার ধ্বংস ঘটিয়ে গেড়ে বসে ভারতভূমিতে। তৎকালীন সিন্ধু অঞ্চলে। বলা যায়, যাযাবর আর্যরা মেহেরগড়-হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো তথা সিন্ধু সভ্যতাকে ধূলিসাৎ করে ভারত সভ্যতাকে বহু বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। **আর্যরা এদেশে নিজেদের দেবতা বলে প্রচার করে। এক কল্পিত জনগোষ্ঠী। শুধু তাই নয়, জনমানসে তাদেরকে সর্বশক্তিমান ও ঈশ্বরের উত্তরসূরী বলে দাবি করে। আর এদেশের উন্নত মানবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষজনদের দৈত্য-দানব-রাক্ষস-খোক্কস দাস-দস্যু প্রভৃতি নামে প্রচার করে।**

শেষমেশ পলায়নরত দেব গোষ্ঠীরা আশ্রম অধিকর্তার (ব্রহ্মা!) পরিকল্পনায় একদল নর্তকীকে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে সঙ্গে আরও কিছু কৌশলী ঘাতক সেনাদের নারী সাজিয়ে মহিষাসুরের রাজসভায় পাঠান হয়। নৃত্য-গীতে পারদর্শী নারীগণ দেবতাদের শত্রু মহান অসুর সম্রাট মহিষাসুরকে হত্যা করার জন্য কমপক্ষে তের দফায় এক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন, যার মধ্যে অন্যতম চুক্তি হল যাযাবর আর্য কর্তৃক নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা, থেকে মুক্তি। যা সেকালের যাযাবর আর্যদের মধ্যে ছিল না। ছিল না আশ্রমভিত্তিক গোষ্ঠীপতিদের সমাজ ব্যবস্থায়। মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনও সভ্যতায় নারীর সামান্যতম সম্মান বা স্বাধীনতা ছিল না। পুরুষের আজ্ঞাবহ ও মনোরঞ্জনের জন্যই নারীর জন্ম, এই বিশ্বাসই ছিল প্রবল। আজও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীর অবস্থানের তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন আর বৃদ্ধকালে

পুত্রের অধীন। অধিনতা-পরাধীনতাই নারীর জীবন। যেখানে স্বাধীন বলে কিছু নেই।

শর্তানুযায়ী, ওই সকল নৃত্য-গীত পারদর্শী নারীগণ সোমরসে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দেয়। যা খেয়ে মহিষাসুরের বীর সেনারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। একে একে তাঁদের হত্যা করে, নারী বেশধারী যাযাবর দেবসেনারা। আর শরীর মর্দনের পর মহিষাসুর যখন ভূতলে লুটিয়ে পড়েন, তখনই প্রধান নর্তকী তার কটিদেশে লুকানো ধারাল অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরকে হত্যা করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাযাবর দস্যু দেবসেনাদল মহিষাসুরের রাজভবন আক্রমণ করে। দেবসেনাদের দ্বারা চলতে থাকে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও গণহত্যা। দেশ বা দুর্গ রক্ষাকারীদের হত্যা করেছিলেন বলে, ওই মূল নর্তকীর নাম হয় দুর্গা। তবে, এ প্রসঙ্গে আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচারিত, সমাজজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকা উদুরদুর্গা বা আদুরদুর্গার কাহিনি আলোচনার দাবি রাখে। আদিবাসী প্রাচীন সমাজে উদুরদুর্গা নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা উদুরের শৌর্য-বীর্য ও সততা ছিল প্রশংসনীয়। সেই সময় যাযাবর আর্যরা তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সর্ব ক্ষমতার অধিকারী দেবতারা। দেবতাদের পরের স্থান মুনি-ঋষিদের। যারা মূলত আর্য ও আর্য বহিঃর্ভূত মানব সমাজের মধ্যে মিশে গুপ্তচরের কাজ করতেন। ধ্যান-তপস্যা, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাঁড়-ফুক এসবই মুনি—ঋষিদের কল্পনাপ্রসু। সংখ্যায় বেশি বাকিরা আর্য নামেই পরিচিত ছিলেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র সাত সাতবার উদুরের সঙ্গে সন্ধি ও সখ্যতা করেন। দেবতাদের প্রবল বিক্রম, মুনি-ঋষিদের জ্ঞান-গম্মি আর আর্য জন জাতির সম্মিলিত শক্তি বার বার পরাজিত হয়েছে, সাঁওতাল-মুন্ডা-হো বা খেরোয়াল জাতির নায়ক উদুরের কাছে। প্রকৃত পক্ষে, আদিবাসী সমাজের প্রতিটি মানুষ উদুরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কেন্না, তারা বিশ্বাস করতেন রাজা উদুর কোন পাপ করে না বলেই সে যুদ্ধে জয়ী

হয়। তাছাড়া, মহাবিক্রমশালী আদিবাসী সমাজ একদিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ। তেমনি অপরদিকে ভ্রাতৃত্ববোধে ছিল জাগ্রত। ইন্দ্র শেষমেশ নিজের বোন দুর্গাকে পাঠালেন উদুরের মন ভোলাতে। কিন্তু রাজা উদুর, দুর্গার ছলা-কলায় ভুললেন না। দুর্গার হেরে যাওয়া প্রেমে পরিণত হল। সুযোগ-সন্ধানী ইন্দ্র অধিকৃত অঞ্চল ধরে শাসন করার অধিকার ভাগাভাগির প্রস্তাবের পাশাপাশি নিজের বোন দুর্গার সঙ্গে উদুরের বিয়ে দেন। যদিও এটি ছিল ইন্দ্রের কৌশলমাত্র। অনেকে উদুরদুর্গা ও মহিষাসুর এক ব্যক্তি বলে মনে করেন।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আদিবাসীরা বীর। **খেরোয়াল ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল। জঙ্গলে বসবাস করে বলে আদিবাসী সমাজ একদিকে যেমন সরল, তেমনি অন্যদিকে জঙ্গলের মত শান্ত ও শান্তিপ্রিয়। মূলত সরল বিশ্বাসী বলে। কূট কৌশল প্রিয় চতুর দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে বিশ্বাস করলেন। দুর্গাকে বিয়ে করে শান্তির পথ বেছে নিলেন। প্রকৃত অর্থে, এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে উদুরের দুর্বলতা ও দুর্বল মুহূর্তের খোঁজ নেওয়া। ইন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।** বোন দুর্গার নিকট থেকে যাবতীয় খোঁজ নিতেন উদুরের। দুর্গার কাছ থেকে ইন্দ্র জানতে পারলেন যে, সর্বদাই সাত রক্ষী উদুরকে ঘিরে থাকলেও শোবার ঘরে তারা থাকে না। এমনকি শোবার ঘরে আসার পূর্বে তার অতি প্রিয় অস্ত্রগুলি রেখে আসেন। ইন্দ্র তার বাছাই করা চারজন দক্ষ সেনাকে পাঠালেন উদুরের রাজপ্রাসাদে। যারা দুর্গার পূর্ব পরিচিত। আত্মীয় জ্ঞানে বিশ্বাস করাই উদুরের কাল হল। উদুর অনায়াসে অপহৃত হলেন। সরল বিশ্বাসী জঙ্গলবাসী আদিবাসী সমাজ বুঝতেই পারলেন না তাদের প্রিয় রাজা, প্রাণের মানুষ অপহৃত হয়েছেন। শেষে বুঝতে পেরে আদিবাসী ছেলেরা ময়ূরের পেখমের পোশাক পরে মেয়ে সেজে খুঁজতে বের হলেন। পেখমের পিছনে লুকোলেন তির। ধনুকটাকে বাকিয়ে বানালেন এক তারের যন্ত্র। যার নাম ভুয়াং বা বুয়াং। তার ছিলায় টঙ্কার

দিয়ে বাজাতে থাকলেন এমন একটি গান, যার অর্থ কেবলমাত্র মহারাজ উদুর জানেন। এই গানের তালে তালে নাচতে নাচতে তারা প্রত্যেক বাড়ি থেকে কিছু না কিছু চাইতে থাকেন। কেবলমাত্র এই একটি নাচের সময়েই আদিবাসীরা অন্যদের কাছে হাত পেতে কিছু চায়। জনসমাজে এই নাচটি 'দশাঁয়' নামে পরিচিত। এই চাওয়ার মধ্যে ভিক্ষা মনোবৃত্তি নেই। চাওয়ার মধ্যে সকলের মনে মহিশাসুরের খোঁজ ছিল।

এখনও পর্যন্ত সর্ব প্রথমে অসুর পুজো হয়। তার পর দুর্গার পুজো হয়। এর পিছনের ঘটনাটিও চমকপ্রদ। দেবরাজ ইন্দ্র তার বোন দুর্গাকে বন্দি উদুরকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমনকি বনবাসী মহান রাজা উদুরকে হত্যা করলে দুর্গাকে দেবী রূপে পুজো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজি হলেন না দুর্গা। বরং বললেন, উদুর আমার স্বামী, তাকে হত্যা করে, বিধবার বেশে জগতের পুজো আমি চাই না। প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র বলেন, উদুর তোর স্বামী নয় শত্রু। জঙ্গলবাসী অসুর সম্প্রদায়। আমরা আর্যভাষি। তোর বিবাহ উদুরকে হত্যা করার একটি কৌশল মাত্র। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে আর্য, মুনি-ঋষি, দেবকুল তাদের শত্রুকে নিধন করে থাকেন। আমিও তোকে উদুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেই কৌশল অবলম্বন করেছি মাত্র। কথা বাড়িও না। উদুরকে হত্যা কর। দেবকুল তোমাকে দেবী রূপে স্বীকৃতি দেবে। তথাপি দুর্গা সধবা রূপে পুজোর দাবি করলেন। শেষমেশ, সভাসদগণ এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সেহেতু দুর্গা আর্য ভাষা আর উদুর প্রাচীন দেশীয় জঙ্গলবাসী সেহেতু উদুর থাকবে দেবীর পদতলে। দুর্গা সধবা অবস্থায় পুজো পাবেন। নবমীর রাত্রি চারজন সেনার সহযোগিতায় উদুরকে হত্যা করেন। মূলনিবাসী (অসুর, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি) সমাজের ধর্মীয় কাহিনীতে আজও প্রচারিত আছে যে, খেড়োয়াল মাতা কালী শিবের পত্নী। সমন্বয়বাদী খেড়োয়াল গুরু শিব ভোলানাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হুদুর দুর্গাকে যাযাবর আর্যদস্যুরা

তৎকালীন গণিকা সুন্দরী কন্যা পার্ব্বতিকে দিয়ে অন্যায় ভাবে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্যে দিয়ে আর্যদস্যুরা প্রতিষ্ঠা করে। নীতিহীন ভাবে হুদুর দুর্গাকে হত্যা করার প্রতিবাদে খেড়োয়াল মাতা কালী আর্যপুরুষদের হত্যা শুরু করে। ভয় পেয়ে আর্যভাষার নারীরা শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব তার স্ত্রীর এই কার্য থেকে বিরতির জন্য (আজকের ভাষায় 'অনশন') রাস্তায় শুয়ে পড়লেন। স্ত্রী ধর্ম পালনে স্বামীর বুকে পা স্পর্শে কালী। কালীর সম্বিত ফেরে। কিছুটা শান্ত হয়। দেব পুরুষদের হত্যা বন্ধ করে। পরদিন মিলেমিশে থাকার প্রতিশ্রুতিতে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান শুরু করে। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা 'যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' এই বাণীতে সকলে মিশে গেল। আর্যরা এই সময় থেকে কালীপুজো শুরু করে। এদিকে খেড়োয়াল মূলনিবাসী মানুষেরা চরম আনন্দে মেতে ওঠে। তাদের এই পরবের নাম—"বাঁদনা-সহরাইপরব"। এই বাঁদনা সহরাই পরব এর শুরুতে অমাবস্যার আরম্ভ মুহূর্তে গ্রামের সকলে গ্রামের প্রান্তে "ইন্দোই পিঞ্জই" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্র ও অলক্ষ্মী হিসেবে দেবী দুর্গার কুশপুত্তলিকা দাহন করে। দাঁশায় দশমীর দিন থেকে পরের তিন-চার দিন চলে। সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত রক্তের শুদ্ধতায় বিশ্বাসী আর্যরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থে আদিবাসী বা অন্যান্য প্রাক্ ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। পরাজিত ভারতীয় দুর্গ বা দেশ রক্ষকগণকে আর্যরা রাক্ষস বলে অভিহিত করত। পরবর্তীকালে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাদের কাব্য সাহিত্যে রক্ষস শব্দের র বর্ণের পর একটি 'া' যোগ করে রাক্ষস বলে লিপিবদ্ধ করেন। হিন্দু শাস্ত্রকারদের কাছে রাক্ষস শব্দ হীন-অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক। যাযাবর আর্যদের যে দল সিন্ধু অঞ্চলে বিজয়ী হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কোনও নারী ছিল না। এদেশের নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত সন্তান উৎপাদন করতে। সেই কারণে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নারী মাত্রই শূদ্রাণী। সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেও শূদ্রাণী। ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মালেও শূদ্রাণী।

নারীর তাই পৈতে ধারণ বা দ্বিজ হওয়ার প্রথা নেই। সে সময় যাযাবর সমাজে নারীর কোনও মান-মর্যাদা-সম্মান ছিল না। তথাকথিত বেশ্যা বা পতিতাবৃত্তি ছিল আর্যসমাজের বেশিরভাগ নারীর জীবিকা। বর্তমান বঙ্গের কালীঘাট ও সোনাগাছির মত জায়গাগুলি তৈরি হওয়ার পিছনে রয়েছে আর্য-দেবতাদের উত্তরসূরী বর্ণবাদীদের নোংরা মনোবৃত্তি।

বেশ্যা অর্থে পতিতা। 'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা' শব্দের অর্থ পতিতালয়ের দ্বারমৃত্তিকা। দুর্গাপুজোয় এই পতিতালয়ের দ্বারমৃত্তিকার ব্যবহার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারেরা মনে করেন, বেশ্যাদ্বার পুণ্যশোষী। যে পুরুষ, বেশ্যালয়ে প্রবেশ করেন তার সমস্ত পুণ্যবল ওই বেশ্যাদ্বার শোষণ করে নেয়। বেশ্যাগামী পুরুষ পুণ্যরিক্ত হয়ে ওই পাপ গৃহে প্রবিষ্ট হয়। যেহেতু বেশ্যাদ্বার সকল পুরুষের পুণ্যশোষণ করে নেয়, তাই ওই দ্বার সংলগ্ন মৃত্তিকা পবিত্রা এবং মহামায়ার স্নানের উপযোগী। সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র ব্যাখ্যা।

আর্যসমাজে বহুগামিতা এবং বহুভর্তৃকত্ব অর্থাৎ বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগের ঘটনার একাধিক উল্লেখ রয়েছে। আর্যদের নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে একজন বিবাহিত মহিলা স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ দ্বারা বংশধারণের জন্য তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করাতে পারতেন। এই প্রথায় অবাধ যৌন সম্ভোগ চলেছিল, যেহেতু তার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রথম একজন মহিলার ক্ষেত্রে নিয়োগের সংখ্যার কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। মধুতির ক্ষেত্রে একটি নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল। অম্বিকার ক্ষেত্রে বাস্তবে একটি নিয়োগ হয়েছিল এবং আর একটি ক্ষেত্রে প্রস্তাব এসেছিল। শরদানদায়িনীর তিনটি নিয়োগ হয়। পাণ্ডু তাঁর স্ত্রী কুন্তীকে চারটি নিয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। ব্যুসিতস্বাকে সাতটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল; যে ক্ষেত্রে স্বামীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনও অক্ষমতা ছিল না, সেক্ষেত্রেও নিয়োগ হত। কোন পুরুষকে নিয়োগ করা হবে তা পছন্দ করতেন মহিলাই। এ

ব্যাপারে কার সঙ্গে তিনি নিয়োগে যুক্ত হবেন তা খুঁজে নেবার জন্য এবং একজন পুরুষকেই নিয়োগের জন্য নির্বাচন করলে কতবার তার সঙ্গে নিয়োগ যুক্ত হবেন, সে সম্বন্ধে মহিলারা স্বাধীন ছিলেন। নিয়োগ ছিল পুরুষ ও মহিলার তৎকালীন আর্যসমাজের বৈধ সঙ্গমের আর এক নাম, যেটি এক রাত্রের জন্যও হতে পারে অবার বারো বছর বা তার বেশি সময়ের জন্যও হতে পারে।

তৃতীয় জন্মেজয়ের পুরোহিত বেদের শিষ্য হলেন উতঙ্ক। বেদের স্ত্রী উতঙ্ককে অত্যন্ত শান্তভাবে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্থান নিতে এবং কর্তব্য পালনের দোহাইতে তার সান্নিধ্যে আসতে। আর একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সেটি উদ্দলাকের স্ত্রীর। তাঁর অন্য ব্রাহ্মণদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সে নিজের আগ্রহেই হোক বা কারোর আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই হোক। তাঁর স্বামীর এক শিষ্যের দ্বারা তাঁর এক সন্তান হল শ্বেতকেতু। জটিলা গৌতমী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ মহিলা। যাঁর সাতজন স্বামী ছিলেন। যারা ছিলেন ঋষি। মহাভারত বলে যে, নাগরিকদের স্ত্রীরা দ্রৌপদীর প্রশংসা করতেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে ঘর করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে জটিলা গৌতমী এবং তাঁর সাত স্বামীর তুলনা করতেন। মমতা উতথের স্ত্রী। কিন্তু উতথের জীবনকালে তাঁর ভ্রাতা বৃহস্পতির মমতার কাছে অবাধ যাতায়াত ছিল। মমতার পক্ষ থেকে তার প্রতি আপত্তি একবারই উঠেছিল। যখন মমতা অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তিনি একথা বলেননি যে বৃহস্পতির তাঁর প্রতি আবেদন বেঠিক বা বেআইনি ছিল।

মহাভারতের বনপর্বের ১০০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একটি হরিণীর সঙ্গে সহবাস করেন এবং সেই হরিণী তাঁর পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সে পুত্র পরবতীকালে ঋষ্যশৃঙ্গ বলে পরিচিত হন। মহাভারতের আদি পর্বের ১ এবং ১১৮ অধ্যায়ে পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু কিভাবে দম নামে ঋষির অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন।

ব্যাস বলছেন যে, ঋষি একবার জঙ্গলে একটি হরিণীর সঙ্গে সঙ্গমে আবদ্ধ ছিলেন। যখন এভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন তখন পাণ্ডু সঙ্গম ফুরিয়ে যাবার আগেই ঋষিকে তীরবদ্ধ করেন। আর্য ঋষিদের আর একটি জঘন্য প্রথা ছিল যে, তাঁরা প্রকাশ্যে এবং জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতেন। মহাভারতের আদি পর্বের ৬৩ অধ্যায়ে কেমন করে ঋষি পরাশর ধীবর কন্যা সত্যবতী ওরফে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেছিলেন। ব্যাস বলছেন, যে, ঋষি প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে সত্যবতীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। আর একটি অনুরূপ ঘটনা পাওয়া যায় আদিপর্বের ১০৪ অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঋষি দীর্ঘতম জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে একজন মহিলার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে। **অধিকাংশ, তথাকথিত হিন্দুই জানেন যে, সীতা, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য যশস্বী মহিলারা উল্লেখযোগ্য অযোনিজ। অযোনিজ বলতে বোঝায় একটি শিশু, যে মানবের তথাকথিত আদিমতম (ধর্মীয় ভাষার) পাপ ছাড়াই জন্মেছে। তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে অযোনি শব্দের এরকম অর্থ নিশ্চয় করে বলা যায় না। যোনি শব্দটির মূল অর্থ হল গৃহ। যোনিজ শব্দের অর্থ একটি শিশু যে গৃহে জন্মেছে বা গর্ভজাত হয়েছে। অযোনিজ শব্দের অর্থ একটি শিশু যে গৃহের বাহিরে জন্মেছে বা গর্ভজাত হয়েছে। অযোনিজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুয়ী হয় সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীর প্রকাশ্যে জনসমক্ষে যৌনসঙ্গমের ফসল।**

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোনও ঋষি যজ্ঞ সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত থাকবেন তখন কোনও মহিলা যদি সেই ঋষির সঙ্গে যৌনসঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে সেই ঋষি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না

করে এবং কোনও নির্জন স্থানে যাওয়ার জন্য কালক্ষেপ না করে, সেই যজ্ঞ মণ্ডপেই জনসমক্ষে সেই মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হবেন। ঋষিদের এই কাজটিকে বামদেব ব্রত বা বাম-মার্গ বলা হয়।

আর্যদের বাসনা ছিল ভাল বংশধর পাওয়ার। এই ইচ্ছা তারা পূরণ করত তাদের স্ত্রীদের অধিকাংশ সময় ঋষিদের কাছে পাঠিয়ে। এই ধরনের কাজে যে সব ঋষি নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় প্রচুর। এমন কি রাজারাও তাঁদের অনুরোধ করতেন, রানিদের গর্ভবতী করার জন্য। দেবতাদের দেব যে একটি সম্প্রদায়ের নাম সেকথা প্রশ্নের উর্ধ্বে। রাক্ষস, দৈত্য, দানব ইত্যাদি নামগুলিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। দেবতারা ছিলেন একটি শক্তিশালী এবং লম্পট সম্প্রদায়। তাঁরা ঋষিদের স্ত্রীগণকেও উৎপীড়ন করতেন। ইন্দ্র কিভাবে ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে বলাৎকার করেছিলেন, সে কাহিনি সুপরিচিত। দেবগণ সম্প্রদায় হিসেবে মনে হয়, অন্যান্য আর্য সম্প্রদায়ের উপর অতি প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন(খুব প্রাচীন কালেই। এই অতি প্রভুত্ব আর্য রমণীদের পতিতায় পরিণত করেছিল। দেবতাগণের কাম-লালসা পরিতৃপ্ত করার জন্য। আর্যরা গর্ব অনুভব করতেন, যদি তাদের স্ত্রীরা দেবগণের রক্ষিতা হতেন। এবং তাঁদের দ্বারা গর্ভবতী হতেন। মহাভারত এবং হরিবংশে ইন্দ্র, যম, সাত্য, অগ্নি, বায়ু এবং অন্যান্য দেবগণের ঔরসজাত আর্যরমণীদের সন্তানের এত উল্লেখ আছে যে, যে কেউ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এই দেখে যে, কি পরিমাণে ঐ ধরনের অবৈধ সঙ্গম দেবগণ এবং আর্য রমণীদের মধ্যে চলেছিল।

দেবগণ আর্য রমণীদের ভোগ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ছিলেন। এটি খুব প্রাচীনকালেই নিয়মের অন্তর্গত হয়েছিল। ঋগ্বেদের ১০/৮৫/৪০-এ উল্লেখ রয়েছে একজন আর্য রমণীর উপর প্রথম অধিকার সোমের। দ্বিতীয় অধিকার গন্ধর্বের তৃতীয় অধিকার অগ্নির এবং শেষে অধিকার আর্যদের। **প্রতিটি আর্য**

রমণীকে কোনও না কোনও দেবের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল যে, দেবগণের অধিকার ছিল রজঃদর্শনারম্ভে প্রথম তাকে ভোগ করা। রমণীর কোন আর্যের সঙ্গে বিবাহের আগে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হত, দেবগণকে যথাযথ প্যানা দিয়ে মিটিয়ে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডিকাতে যে বিবাহ উৎসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেই বিবাহে তিনজন দেব উপস্থিত ছিলেন। আর্যমান, বরুণ এবং পূষণ। অবশ্যই তাঁদের অধিকার ছিল, পাত্রীর উপর প্রথম যে কাজটি পাত্র করে। তা হল সে পাত্রীকে একটি পাথরের ফলকের কাছে আনে এবং তাকে পাথরের উপরে দাঁড় করিয়ে বলে, এই পাথরের উপর পদস্থাপন কর এবং পাথরের মত শক্ত হও। শত্রুদের জয় কর। শত্রুদের উপর পদস্থাপন কর। এর অর্থ তিন দেবগণ যাঁদের শত্রু বলে মনে করতেন তাদের দৈহিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পাত্রীকে মুক্ত করা। অন্য দেবগণ ক্রুদ্ধ হন এবং কন্যার দিকে অগ্রসর হন। পাত্রের ভ্রাতা মধ্যস্থতা করেন এবং চেষ্টা করেন বিবাদ মিটিয়ে দিতে। তিনি দেবতাদের ছোলা দিতে চান। তা অবশ্যই কন্যার উপর দেবগণের অধিকার ক্রয় করার জন্য। সেই ভ্রাতা তখন কন্যাকে হাত পাততে বলেন। তিনি তখন কন্যার হাতে ভর্জিত ছোলা দিয়ে ভর্তি করেন। তারপর তাতে শোধন করা মাখন ঢালেন। তারপর পাত্রীকে বলেন, সেটি প্রতি দেবের উদ্দেশে তিনবার করে নিবেদন করতে। এই নিবেদনকে বলা হয় অবদান। তার ভ্রাতা একটি বিবৃতি দেন যেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, এই কন্যা অগ্নির মাধ্যমে আর্যমান দেবকে এই অবদান নিবেদন করেছেন। অতএব আর্যমান এক কন্যার উপর তার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন এবং পাত্রের অধিকারে বাধা দেবেন না। অন্য দুই দেবগণের উদ্দেশে পাত্রী পৃথক অবদান করেন এবং তাদের ক্ষেত্রেও তাঁর ভ্রাতা একই বিধিতে পরিবর্তন করেন। অবদানের পর অগ্নিকে ঘিরে প্রদক্ষিণ হয়, যাকে সপ্তপদী বলা হয়। এরপর পাত্র পাত্রীর মধ্যে

বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ ও শুভ হয়।

আইনজ্ঞরা জানেন যে, সপ্তপদী হচ্ছে হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং এটি ব্যতীত আইনত কোনও হিন্দু বিবাহ-ই হয় না। কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে, কেন সপ্তপদী এত গুরুত্বপূর্ণ। কারণটি খুবই স্পষ্ট। এটি একটি পরীক্ষা যে, যে দেব, যার অধিকার ছিল পাত্রীর উপর, তিনি অবদান দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি পাত্রীকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত। যদি দেব পাত্রকে অনুমতি দিতেন সপ্তপদীর অন্তর্ভুক্ত দূরত্বে পাত্রীকে নিয়ে যেতে তাহলে এটি প্রমাণ হত যে দেব ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং কন্যার উপর তাঁর অধিকার ত্যাগ করেছেন। এবং কন্যা আর একজনের স্ত্রী হবার জন্য মুক্ত হয়েছেন। সপ্তপদীর অন্য কোনও অর্থ থাকতে পারে না। নেই-ইও। সপ্তপদীর আবশ্যিকতা দেখায় দেব এবং আর্যগণের মধ্যে এই ধরনের বাধ্যতা সর্বজনীনভাবে বিরাজমান ছিল।

কৃষ্ণ ছিলেন বৃষ্ণি (যাদব পরিবার) ভুক্ত। যাদবরা ছিলেন বহুগামী। যাদব রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাঁদের অসংখ্য স্ত্রী ও পুত্র ছিল—যে কলঙ্ক থেকে কৃষ্ণ নিজেও মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এই যাদব পরিবার এবং কৃষ্ণ নিজে গৃহ ও পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কীয় নিষিদ্ধ আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে যৌন সংসর্গের কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে ও উপকাহিনীতে ভূরিভূরি প্রমাণ মেলে। মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিবাহের কাহিনি যাদব পরিবারেই ঘটেছিল। **মৎস্য পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের এক পূর্বপুরুষ রাজা তৈত্তিরি নিজের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার গর্ভের নল নামক এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। মাতা-পুত্রে সহবাসের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় কৃষ্ণ পুত্র শাম্বের আচরণ তার জলন্ত উদাহরণ।। মৎস্য পুরাণ বর্ণনা করেছে কিভাবে শাম্ব তাঁর পিতা কৃষ্ণের স্ত্রীদের সঙ্গে অবৈধ জীবন যাপন**

করেছিলেন এবং কিভাবে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সেই কারণে শাম্ব এবং তাঁর অপরাধী স্ত্রীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। এ কাহিনির উল্লেখ মহাভারতে আছে। সত্যভামা দ্রৌপদীকে তাঁর পঞ্চস্বামীর উপর নিয়ন্ত্রণের গোপন কথা জানতে চেয়েছিলেন। মহাভারত অনুসারে দ্রৌপদী তাঁকে তাঁর সতীন পুত্রদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা বা বাস করার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এটি মৎস্য পুরাণের শাম্ব কাহিনির সঙ্গে মিলে যায়। শাম্বই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। তাঁর ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন তাঁর পালিকা মাতা মায়াবতীকে। যিনি ছিলেন সম্বরের স্ত্রী।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, **দেবী দুর্গা শুধুই যৌনতারই প্রতীক। বহু শাস্ত্রে, পুঁথিতে প্রজননের দেবী দুর্গাকে উদ্দাম যৌবনের ও অবাধ মদ্যপানের দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।** তানজোরের পুন্ডমঙ্গেশ্বর ও পূজাইয়ের মন্দিরের দেবীর নাম কোররাবাই। সিংহ ও হরিণ তাঁর বাহন। দেবীর চার হাতে শূল-শঙ্খ-চক্র ও বরাভয়। এই কোররাবাই দেবী দুর্গার আর এক নাম। **প্রাচীনকালে মাদুরাই অঞ্চলের শবর যোদ্ধারা নিজেদের গলা চিরে স্ব-রক্তে দেবীর অঞ্জলি দিতেন এবং অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতেন।** জীমূতবাহনের "কালবিবেক", রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব", শূলপানির "দুর্গোৎসববিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থে দুর্গাপুজোয় আমোদ-প্রমোদই প্রধান ও অবাধ মদ্যপানের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থগুলিতে এই নগ্ন, পণদ্ব পরিহিতা দেবী দুর্গা সম্পর্কে বলছে—"**আদিম রিপুর প্রবৃত্তি এবং অবাধ যৌনাচারের হুল্লোড় না থাকলে দেবী প্রসন্না হতেন না। বরং, কুপিতা এই দেবী উপাসকদের প্রাণভরে অভিশাপ দিতেন**"। শ্রীশ্রীচন্ডী অনুযায়ী দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের পূর্বে মদ্যপান করেছেন। হরিবংশ-এর আর্যাস্তব অনুযায়ী বিন্ধ্যবাসিনী এই দেবীর মদ্য ও মাংসে ছিল অপরিসীম আসক্তি। সপ্তম ও অষ্টম শতকের কবি বাণভট্ট ও বাক্‌পতির মতেও এই দেবী পশু ও মনুষ্যরক্তপিপাসু ছিলেন। কথাসরিৎসাগর-

এর অংশ বেতালপঞ্চবিংশতিতে একাদশ শতাব্দীর **পণ্ডিত সোমদেব ভট্ট রাজা যশকেতুর রাজ্যে আঠারো হাত বিশিষ্ট মদ ও মানুষের রক্তপ্রিয় দেবী দুর্গা মহিষের কাটা মাথার ওপর সদা নৃত্যরতা বলেছেন। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বনবাসী শবর মেয়েরা এখনও দুর্গা মূর্তি বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আকণ্ঠ মদ্যপানের পর উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত করেই নাচতে নাচতে যান।** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'চিৎপুর রোডের এই অংশের দুই পার্শ্ব সেখানে বড় অধিক পরিমাণে বারবণিতাদিগের অধিককৃত থাকিত। ... সেকালে একাল অপেক্ষা মদ্যপানের কিছু বেশি প্রাবল্য ছিল। যাদের গৃহের প্রতিমা বিসর্জন হইত, সেইসকল বাবু যাহাদের পয়সা ছিল তাহারাই প্রতিমার সম্মুখে বাঁশের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটার নাচ নাচাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ... কেহ কেহ নেশার ঝোঁকে ঢলিয়া পড়িতেন। ... বাবুরা তো এইরূপে উর্দ্ধনেত্রে নানাবিধ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে চলিতেন। মদ মাংস কোথাও মনুষ্যরক্ত প্রিয়া দুর্গা সকল দেবতার অস্ত্রে শক্তিশালীও বটে। যুদ্ধ শেষে সকল দেবতারা, তাদের সর্ব অস্ত্র ও তেজ কিরণ নিয়ে নেওয়ায় দুর্গার অন্তিম দৃশ্য হল শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া। দুর্গাপুজোয় বেশ্যা বাড়ির মাটি লাগে কেন? বর্তমান শিক্ষিত সমাজ যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন? প্রকৃত সত্য যে এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে তা স্পষ্ট। অনেক দেবতার তেজরশ্মি থেকে দুর্গার জন্ম, (কার ঔরস জাত? তা জানা যায় না।) তাইদুর্গার জন্মদাতা পিতার নাম কোনও শাস্ত্রে বলা হয়নি।

কোনও অবস্থাতেই আর্যদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য স্বার্থসিদ্ধির হিতার্থে এই দুর্গাপুজোকে সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় কৃষিজীবী, শ্রমজীবী বা সিন্ধু হিন্দু সভ্যতার উত্তরপুরুষদের পক্ষে তো নয়ই। একজন আর একজনকে খুন করছে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা নামক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবস্থান

থেকে মানা যায় না। যতই কেন তা ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত হোক। আবার যিনি খুন হচ্ছেন, তিনিই হলেন কিনা প্রাগার্য বা প্রাচীন মূলনিবাসী সভ্যতার এক প্রতিনিধি। বর্তমানে তো এদেশের আর্য-পরিচয়ের মানুষদের আর্য-মিথ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে; তাহলে আর তথাকথিত হিন্দুধর্মের (আসলে ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী স্বার্থের) দোহাই দিয়ে কেন এই যৌনতার আর হিংস্রতার প্রতীককে পুজো করে মানুষের মানবিক আসনকে অবনমিত করা!